কইতে কথা বাধে

সমরেশ মজুমদার

আরুণি পাবলিকেশনস
৭/১ সি, লিন্ডসে স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০৮৭

অকপটে

কইতে কথা বাধে লেখার ভাবনা মাথায় এলে আমার এক সুহৃদ বলেছিলেন, 'লিখো না, বিপদে পড়বে।'

আমি বলেছিলাম, কাউকে আহত করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। কারও ব্যক্তিজীবন নিয়ে কুৎসা গাওয়ার কথা ভাবছি না। যেমনটি দেখেছি তেমনটি লিখতে চাই।

সুহৃদ জানতে চেয়েছিলেন, 'লেখো তো গল্প-উপন্যাস। হঠাৎ এসব কেন?'

বললাম, 'সেই কবে থেকে দেখে আসছি, সমসাময়িক লেখকদের সম্পর্কে কোনো লেখক কিছু লিখতে চান না। এমনকি প্রকাশ্যে বলতেও শুনি না। অথচ নিভৃত আলাপে মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন না অনেকেই। তাই।'

সুহৃদ বললেন, 'কিন্তু লেখার পর যদি দ্যাখো যাদের কথা লিখছ, তারা অস্বীকার করছে! বলছে, বলেনি! তাহলে?'

আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। তা আবার হয় নাকি!

সুহৃদ বলেছেন, 'শোনো, তোমার অল্প বয়সে যাঁরা চমক দিয়ে শুরু করেছেন, একটু-আধটু আলোচিত হয়েছিলেন এবং তারপর আর কিছু দেওয়ার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও সেই সুবাদে এখনও মঞ্চে জায়গা পেয়ে যান, তাঁদের কারও কারও বুকে ঈর্ষা ছাড়া কোনও বস্তু নেই। আর ঈর্ষা মানুষকে মিথ্যেবাদী করে।'

দেশে শেষ কিস্তি বেরুলো যখন, তখন দেখলাম, সম্পাদক মশাই অতি সতর্ক হয়েছেন। এর আগের সংখ্যাগুলোকে তিনি গুরুত্ব দেননি, সম্ভবত তসলিমার জন্যেই ওই সতর্কতা। অতি উৎসাহে তিনি আমার লেখার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। তাঁর মন্তব্যগুলো শোভন কি অশোভন তা পাঠকরা বিচার করবেন। সম্পাদক বলেছেন, এটি নাকি আমেরিকান-সম্পাদনার নিদর্শন। জানি না। তবে মনে হচ্ছে 'তসলিমা বাঁচাও' কমিটি তৈরি হলে তার সভাপতি এই কাণ্ডটি করতেন।

কবি শামসুর রহমান প্রচুর পান করে গাড়িতে বসেছিলেন বলে লিখেছিলাম। সম্পাদক মশাই ব্রাকেটে লিখেছেন, উনি অস্বীকার করেছেন। কেন করেছেন?

আমি মিথ্যে লিখেছিলাম? না, মাঝরাতে পানে জ্ঞান হারালে কী ঘটছে চারপাশে তা পরের দিন জেগে ওঠার পর মনে থাকে না। তাই অস্বীকার। বাঃ। বুদ্ধদেব গুহ অস্বীকার করেছেন তসলিমার টেলিফোন করার ব্যাপারটা। সম্পাদক সেটাই লিখেছেন ব্রাকেটে। বুদ্ধদেবদা সেটা পড়ে বলেছেন তসলিমার ফোন তিনি পেয়েছিলেন এবং কখনোই অস্বীকার করেননি। তবে তাঁর বিশ্বাস সাক্ষাতে আমাকে বলেছেন ঘটনাটা, ঢাকায় ফোন করে নয়।

আলতাফ হোসেনের সন্ধান পাওয়া যায়নি মানে চরিত্রটি আমার কল্পিত। কিন্তু ভদ্রলোক রোজ ঢাকার বাংলা বাজারে যান। ওঁর ডাক নাম মেনু। সবাই মেনুভাই বলে জানে। বিশাল দোকান তাঁর, পার্ল পাবলিকেশন। সম্পাদক অবশ্য আমাকে একটু অক্সিজেন দিয়েছেন এই বলে, কবির ভাই-এর বাড়িতে নিজের পায়ে না-দাঁড়ানো তসলিমাকে দেখেছেন এমন কিছু সাক্ষীর সন্ধান তিনি পেয়েছেন। অর্থাৎ কোনো লেখক কিছু লিখলে সম্পাদক তা ডিটেকটিভ এজেন্সির কাছে পাঠাবেন। তাদের মন্তব্য ব্রাকেটে ছাপবেন। যেন চোরকে খোঁচা দিচ্ছেন। যদি সম্পাদক মনে করেন লেখক মিথ্যে লিখছেন, তাহলে জেনেশুনে সেই লেখা তিনি ছাপছেন কেন? লেখার শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকতে পারত। পরবর্তী সংখ্যায় চিঠিপত্রে গালাগাল দেওয়া যেতে পারত।

প্রায় দু'মাস গবেষণা করার পর সম্পাদক যে শেষ পর্যন্ত লেখাটা ছেপেছেন, এতে আমি কৃতার্থ। কিন্তু বিস্ময় আরও অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে।

ষাটের দশকে সুনীলদারা যখন হৈ হৈ করে লেখা শুরু করলেন, তখন একজন লেখক তাঁর নিজস্ব গদ্যের জন্যে কিছু স্তাবক তৈরি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাদের বেশিদিন ধরে রাখার ক্ষমতা ছিল না। সুনীলদারা অনেক এগিয়ে যাচ্ছেন অথচ তিনি পারছেন না বলে এমন ঈর্ষায় আক্রান্ত হলেন যে তাঁর লেখায় অশ্লীলতার বন্যা বইতে লাগল। শ্রদ্ধেয় সন্তোষ কুমার ঘোষকে বেনামে চিঠি লিখতেন গালাগাল দিয়ে। তার ভাষা বেশ জোরালো ছিল কিন্তু নির্বাচিত অশ্লীল শব্দ থেকে পচা গন্ধ বের হত। ইনি বড় কাগজগুলোয় লেখার আমন্ত্রণ পেতেন না। প্রথম দিকে তরুণ লেখকদের সঙ্গে শিং ভেঙে মিশে যাওয়ার

চেষ্টা করেছেন, পরে প্রাক্তন বন্ধুদের সঙ্গ চেয়েছেন যাতে একটু ভদ্রলোক হওয়া যায়। ষাট বছদিন পেরিয়ে আসা মানুষটিকে আমি লক্ষ্য করেছি দীর্ঘকাল। আমার সঙ্গে কখনোই কথা হত না। কিন্তু ইদানীং বইমেলায় গেলে মুখোমুখি হলে দু-একটা কথা বলেছি, উনিও শান্তির জল-খাওয়া-মুখ করে কথা বলেছেন আমার সঙ্গে। সেই সময় ওঁর মুখ থেকে সুনীলদার অতীতকালের একটি প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। বেশ রসিয়ে তিনি বলেছিলেন। শ্রোতা ছিলেন আরও দু-জন। গতকাল শুনলাম, তিনি অস্বীকার করেছেন। বলেছেন আমার সঙ্গে এসব কথা হয়নি। উনি জানেন না, কথাটা শোনার পরের সকালে টেলিফোনে সুনীলদার সঙ্গে এই ব্যাপারে আমার আলোচনা হয় এবং সুনীলদার বক্তব্য আমি জানতে পারি।

তাহলে এই ভদ্রলোকের মিথ্যাচারণের কারণ কী? অবশ্যই সুনীলদার বিপক্ষে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছেন না। লুকিয়ে যা বলা যায়, প্রকাশ্যে তা স্বীকার করলে যদি আখের নষ্ট হয়! হায়, অন্তর্জলি যাত্রার সেই বৃদ্ধের সঙ্গে তফাৎ করা যাচ্ছে না। এখনও লালা গড়াচ্ছে!

দশচক্রে ভগবানও ভূত হয়। বামুনের কাঁধের ছাগলকে বলতে বলতে কুকুর বানানো যায়। সজ্জনেরা এমন চাল চেলেছেন যে মনেই হবে কইতে কথা বানানো। উপন্যাসের গোড়ায় যেমন কেউ কেউ লেখেন, সব চরিত্র কাল্পনিক, তেমনই। কিন্তু সময় বড় কঠিন দাওয়াই। ভূতকে পালাতে হবে, কুকুর ছাগল হবেই। এইটেই এঁরা বোঝেন না।

সুহৃদ উপদেশ দিয়েছিলেন, লিখো না। বিদ্বজ্জনরা চোখ পাকিয়েছেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকরা যেসব চিঠি লিখছেন তা আমাকে আশ্বস্ত করেছে এই কারণে, সমসাময়িকদের নিয়ে লেখালেখি করাটা দরকার ছিল। আর কতকাল জঙ্গলে মুখ ঢুকিয়ে সারা শরীরটাকে শিকারীর সামনে তুলে ধরব?

সমরেশ মজুমদার

কইতে কথা বাধে

সমসাময়িক লেখকদের নিয়ে খোলাখুলি লিখতে একটু সংকোচ হবেই। এমনকি সাহিত্যের যাঁরা অভিভাবক সেই সব সমালোচকরা মৃত লেখকদের রচনা নিয়ে কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমেও এই ব্যবস্থা চলছে। তবে ইদানীং, কেউ কেউ জায়গা পাচ্ছেন, খুবই শীর্ণ পরিসরে। বাঙালির চরিত্র অনুযায়ী ব্যাপারটা খুব বেমানান নয়।

ছাত্রাবস্থায় অচিন্ত্যকুমারের কল্লোলযুগ পড়েছিলাম। বোধহয় সেই প্রথম আমি ওঁর ভক্ত হয়েছিলাম। অনেক পরে তিনি ম্লান হেসে আমাকে বলেছিলেন, 'প্রচুর শত্রু তৈরি করেছি ঐ বই লিখে।' মুশকিল এখানেই। সমসাময়িকেরা সবসময় খোলা কথা ভালো মনে নিতে পারেন না। সত্তর দশকের অনুজ লেখকদের নিয়ে শ্রদ্ধেয় বিমল কর চমৎকার একটা লেখা লিখেছিলেন। কিন্তু লেখক যে স্নেহপ্রবণ তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু লেখকের লেখা নয়, শুধুই লেখককে নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে মাঝেমাঝেই হয়। যে সমস্ত লেখকের সংস্পর্শে এসেছি এবং তাঁদের যে রকম ভাবে দেখেছি তা নিয়ে লিখতে হাজার সমস্যা। ব্যাপারটা অনেকটাই অন্ধের হস্তিদর্শন হয়ে যেতে পারে। সমরেশ বসু বা সন্তোষ কুমার ঘোষকে আমার চেয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতেন এমন মানুষের অভাব নেই। তাঁদের চেনার সঙ্গে যে আমার চেনা মিলবেই এমন দাবি করা বোকামি। তাছাড়া এখন মানুষের জীবনযাপনের মধ্যে নানান খোপ রয়েছে। অফিসে একরকম, জুয়োর টেবিলে আর এক রকম, ক্লাবে অন্য রকম, আবার রাতে বাড়িতে ফিরে একেবারেই আলাদা। এর সঙ্গে ওর কোনও মিল নেই এমন মানুষ আমি অনেক দেখেছি। হয়তো আমি নিজেই তাই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমি প্রথম চিনি মাস্টারমশাই হিসেবে। উনি এক সময় জলপাইগুড়িতে পড়াতে গিয়েছিলেন। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। কিন্তু গল্পের বই পড়ি। শেষ দিকে, ওঁর লেখার ভক্ত হলাম। গোগ্রাসে ওঁর সব লেখা পড়লাম। ঘনিষ্ঠ হলাম কলকাতায় পড়তে এসে। ওঁকে মাস্টারমশাই হিসেবে পেয়ে।

মানুষটির চেহারায় একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। ওঁর কাছে আমরা পৃথিবীর অন্য ভাষায় লেখা ছোটগল্পগুলোর খবর জেনেছিলাম। ততদিনে বুঝে গিয়েছি চমক দিয়ে ছোটগল্প শেষ করার কায়দাটা আর উঁচু মানের সাহিত্য নয়! ও হেনরি থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যা করেছেন তা পরবর্তী লেখকদের করা ঠিক নয়। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। মাস্টারমশাই একদিন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পড়াচ্ছিলেন। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে পিনাকেশ সামনের সারিতে বসত, বাকিরা পেছনের দরজার গায়ে, যাতে ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে যাওয়া যায়। আমার পাশে বসে সীতানাথ জিজ্ঞাসা করেছিল, কাকে আমি প্রেমিকা হিসেবে চাই? অচলা না লাবণ্য। আমি সোৎসাহে দুজনকেই খারিজ করে যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছিলাম। কথা হচ্ছিল নিচু স্বরে। মাস্টারমশাই যে সেটা লক্ষ্য করে পড়ানো বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তা টের পাইনি। শেষপর্যন্ত তিনি গলা তুলে বললেন, 'সমরেশবাবু, অনুগ্রহ করে কি একটু উঠে দাঁড়াবেন?'

উঠলাম। সতীর্থরা খুব মজা পাচ্ছিল আমার দুরবস্থা দেখে।

মাস্টারমশাই বললেন, 'আমরা এখানে ছোটগল্প নিয়ে একটু কথাবার্তা বলছিলাম। বিষয়টা নিশ্চয়ই আপনার জানা তাই কর্ণপাত করেননি। তাই এবার আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। আপনার প্রিয় কোনও একটি ছোটগল্পের নাম বলুন।'

দ্রুত জবাব দিয়েছিলাম, 'টোপ'।

মাস্টারমশাই এরকম উত্তর অবশ্যই আশা করেননি। ওঁর মুখ দেখে তা বোঝাও যাচ্ছিল। বললেন, 'বসুন'।

কিন্তু ক্লাসের সমস্ত ছাত্রছাত্রী মাস্টারমশাইকে রেহাই দিল না। তারা টোপ নিয়ে আলোচনা করতে চাইল। মাস্টারমশাই কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চশমা খুলে কাচ মুছতে মুছতে বললেন, 'টোপ গল্পটি পড়তে বোধহয় মন্দ লাগে না। কিন্তু গল্পটি শেষ করার পর বুঝতে অসুবিধে হয় না এটা পরিকল্পিত রচনা। শেষ চমকের জন্যে অঙ্ক কষে লেখা হয়েছে। এটা বুঝতে পারা যায় বলেই -।' তিনি হাসলেন, 'আচ্ছা, আমরা যেখানে থেমেছিলাম - !'

আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কয়েকটি ছোটগল্পের একটি বলে অনেকে টোপকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু মাস্টারমশাই নিজের রচনা সম্পর্কে নির্মোহ হবেন এটা ভাবতে পারিনি। এটি আয়ত্ত করা যে কী কঠিনকর্ম তা পরে বুঝেছি।

মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম লিখতে গিয়ে মনে হল ওঁর অজস্র ছাত্রছাত্রী এই কথা বলতে পারেন। ওঁর বৈঠকখানার বাড়িতে কতবার গিয়েছি। সেসময় তিনি লিখতেন প্রচুর। পুজোর সময় কোনও কাগজ বাদ যেত না। প্রতিবাদ করলে বলতেন, কাকে না বলব? এই কাউকে না বলার অক্ষমতা তাঁকে দুর্বল করেছে। এক বর্ষার দুপুরে আমায় বলেছিলেন, 'দ্যাখো আমার পুঁজি অল্প। ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাই। তাই আমার গল্পের কুষ্ঠরোগী সিনেমার পোষ্টারের নায়িকার গালে ঠোঁট রাখে। তুমি তারাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, ওঁকে এ সব লিখতে হয়নি।'

'দেশ' - এ সুনন্দর জার্নাল বেরুচ্ছিল। প্রচন্ড জনপ্রিয় রচনা। প্রকাশনায় নামব বলে তাঁর দ্বারস্থ হতেই তিনি এক কথায় সেটি ছাপতে দিলেন। এখন বুঝেছি কি উদ্ধত আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার। কলকাতার তাবৎ বিখ্যাত প্রকাশক যে বই ছাপতে উদ্যোগী, যাঁদের কাছে অর্থ ও নিরাপত্তা রয়েছে, তাঁদের বঞ্চিত করে আমার মতো নবীন বিত্তহীনকে ওই বই দিয়েছিলেন তিনি। এটা প্রায় গলায় কলসী বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া। কিন্তু মাস্টারমশাই বলেছিলেন, 'ছাপো'।

আমার প্রকাশনার আয়ু ছিল এক বছর। কিন্তু সেই কারণে মাষ্টারমশাইকে আপসোস করতে শুনিনি। উলটে বলেছিলেন, 'ব্যবসা করা সবার ধাতে নেই।'

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মাস্টারমশাই নারায়ণবাবুর বাইরে আর একজন নারায়ণবাবু আমাকে আকর্ষণ করতেন, তিনি এক রোমান্টিক পুরুষ। ওঁর চেহারা চালচলনের মধ্যে তার প্রকাশ স্পষ্ট ছিল। ওঁর প্রথম স্ত্রীকে আমি দেখিনি, আশাদি ছিলেন দ্বিতীয়া স্ত্রী। লিখতেন। জলপাইগুড়ির মেয়ে বলে আমি ওঁর কাছের লোক হয়েছিলাম। ছোটখাটো মানুষটিকে দেখে আমার কেবলই

মনে হত মাস্টারমশাই -এর সঙ্গে ঠিক মিলছে না। প্রতিভাবান মানুষেরা তৃপ্তি সহজে পান না। এ ব্যাপারটা তো সমরেশ বসুর মধ্যেও দেখেছি।

আমাদের এক সহপাঠিনী, যিনি বয়সে বেশ বড় ছিলেন, মাস্টারমশাই-এর প্রতি নিমগ্না বলে প্রচারিত ছিল। মাস্টারমশাই যদি অমিত রায় হন তা হলে তিনি লাবণ্যের ধারে কাছে ছিলেন না। বরং অত্যন্ত শান্ত, চুপচাপ। মাস্টারমশাই-এর সব রচনা তাঁর মনস্থ, তিনি যখন পড়াতেন তখন ভদ্রমহিলা যেভাবে তাকাতেন তাতে মনে হত অর্জুনের মতো মাছের চোখ দেখছেন। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ি তখন একদিন সাহস করে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম এই ব্যাপারে। তিনি কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'কি জানি!'

মাস্টারমশাই-এর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম রাতে। ভোরবেলায় ছুটেছিলাম পি জি হাসপাতালে। তাঁর ছাত্ররা তো বটেই, যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের কেউ বাদ যাননি সেই ভোরে হাসপাতাল চত্বরে পৌঁছতে। যুবক ছাত্র হিসেবে যখন আমরা শেষযাত্রার আয়োজন করছি তখন যে ঘটনা ঘটেছিল তা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত হয়তো কখনও কখনও ঘটবে। মাস্টারমশাই-এর পায়ের কাছে পাথরের মতো বসেছিলেন আমাদের সেই সহপাঠিনী। জন্ডিসে নীরক্ত শরীর নিয়েও রাজার মতো শুয়েছিলেন মাস্টারমশাই। আর তখনই আশাদি এলেন। এসে তীব্র চিৎকার করে ভদ্রমহিলাকে ধিক্কার দিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। তৎপর হয়ে এই আদেশ পালন করল কেউ কেউ। শেকড়সুদ্ধু গাছকে টেনে তুলতে দেখা খুব বেদনাদায়ক। পরে যখন মাস্টারমশাইকে লরিতে চাপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছিলাম তখন ছাত্ররা স্লোগান দিচ্ছিল, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যুগ যুগ জিও।' কিন্তু আমি ভাবছিলাম আত্মা বলে যদি কিছু থাকে তা হলে মাস্টারমশাই-এর আত্মা ওই মুহূর্তে কতটা ভাল থাকতে পারেন?

টেনিদা থেকে শুরু করে সুনন্দ, যে কোনও জীবিত লেখকের থেকে বেশী জীবিত ছিলেন মাস্টারমশাই। আমরা কেউ ভাবতে পারিনি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি পাঠক তাঁকে ভুলে যাবে। একমাত্র টেনিদা তাঁকে বেশ

কিছুদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এই প্রজন্মের কিশোরদের কাছে টেনিদা তেমন কোনও আকর্ষণ নন। অনেক লেখক বেঁচে থাকার সময় টিমটিম করে বেঁচে থাকেন। মারা যাওয়ার পর তাঁদের হারিয়ে যাওয়ার কারণ বুঝি। কিন্তু যিনি লিখে বেঁচেছিলেন প্রবলভাবে, মৃত্যুর পর তাঁরও একই অবস্থা হবে এটা ভাবিনি। কিন্তু সত্য সবসময় নির্মম।

এখন আমরা যারা লেখালেখি করি তারা প্রায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হয়ে গেছি। হঠাৎ দেখা হলে হাসি, দু চারটে কথা বলি, ওই পর্যন্ত। অন্যের লেখা পড়া দূরের কথা অনেকেই মনে হয় নিজের ছাপা হওয়া লেখা পড়েন না। অথচ কল্লোল, কালিকলম থেকে কৃত্তিবাস পর্যন্ত এরকম ছিল না। পারস্পরিক মত বিনিময়, আলোচনা এবং আড্ডা সেসময়ের লেখকদের কাছাকাছি এনে দিত। ব্যতিক্রম হয়তো ছিল। তারাশঙ্করকে বিমল মিত্র সহ্য করতে পারতেন না। মনে আছে গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনের হলে একটি অনুষ্ঠানে বিমল মিত্রের পাশের চেয়ারে বসার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন তিনি জরায় আক্রান্ত। বললেন, 'তোমার লেখা পড়েছি। মানুষ গল্প পড়তে চায়, ওটা লিখতে পারলে থাকবে নইলে নয়, আচ্ছা, বলতো, তারাশঙ্কর কেমন লেখক?'

হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম ছয়জন লেখক যদি বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এবং সমরেশ বসু হন তা হলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনও মানে হয় না। বললেন, 'লজ্জা পাচ্ছো কেন? তা হলে বলি শোন। দেশ পত্রিকায় ওঁর লেখা বেরুচ্ছিল। সাগরবাবু আমার সাহেব বিবি গোলাম ছাপলেন। পাঠকরা বলল ওঁর লেখা বন্ধ করতে আর আমার লেখা চালিয়ে যেতে।

অনুষ্ঠান চলছিল। সেদিকটা উপেক্ষা করে বলে চললেন, 'একদিন এক প্রকাশকের গাড়িতে বাড়ি ফিরছি। তা তিনি বললেন, 'একবার তারাশঙ্করবাবুর বাড়ি ঘুরে যাব। আজ ওঁর জন্মদিন।' গিয়ে দেখলাম ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। লোকজন ঢুকছে। কোনও লেখক পকেটের পয়সা খরচ করে নিজের জন্মদিন পালন করে বলে আমি ভাবতে পারি না। গাড়ি থেকে নামছি না দেখে তারাশঙ্কর

এল। বললাম নামব না, লেখা আছে। সে বলল, 'জমিদারদের গল্প লিখতে তো ভাবতে হয় না, এত তাড়া কিসের!' রাগ হল। বাড়ি এসে কলম ধরলাম। লিখলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম। আধুনিক জীবন কাকে বলে তা ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিলাম। বুঝলে?'

একজন বয়স্ক মানুষ যখন ছেলেমানুষের মতো অভিমান করেন তখন আমাদের মজা লাগে। তারাশঙ্কর থাকতেন টালা পার্কে, বিমল মিত্র চেতলায়। হঠাৎ সরকারী বাসের নতুন রুট চালু হল, তেত্রিশ নম্বর। বাসটি টালা পার্ক আর চেতলার মধ্যে যাতায়াত করবে। আমি অনুমান করি সুযোগসন্ধানীরা এই বাসটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন একটি লিটিল ম্যাগাজিন করার বাসনা হয়েছিল। আমরা ঠিক করলাম সমরেশ বসুর কাছে লেখা চাইব। প্রতিষ্ঠিত লেখকরা লিটল ম্যাগাজিনে লেখেন না। লিটল ম্যাগাজিনের ছেলেমেয়েরা অহংকারী হয়ে তাঁদের লেখা ছাপতেও চায় না। আমাদের মনে হয়েছিল সমরেশ বসুর মতো লড়াই করে উঠে আসা মানুষ নিশ্চয়ই ওইসব লেখকদের দলে পড়েন না।

তখন বিংশ শতাব্দী এবং কথামালা নামে কাগজ বের হত গ্রে স্ট্রীট থেকে। সেই বাড়িতে সমরেশ বসু দুপুরে লেখেন বলে খবর পাওয়া গেল। এক দুপুরে আমরা সেখানে হানা দিলাম। দপ্তর থেকে বলেছিল, উনি দোতলায়, লিখছেন। যখন অনুমতি পাওয়া গেল তখন সেই ঘরে পৌঁছানো মাত্র ওঁর হাসিতে আক্রান্ত হলাম, 'কি ব্যাপার?' বিছানায় আধশোয়া সমরেশ বসুর সঙ্গে উত্তমকুমারের কোনও পার্থক্য খুঁজে পাইনি।

আমরা আমাদের বক্তব্য জানালাম। কোনও দক্ষিণা দেওয়া সম্ভব নয়।

উনি হাসলেন, 'দ্যাখো, এখন আমার খুব টাকার দরকার। প্রতিটি শব্দ লিখছি টাকার জন্যে। লেখা কেন, আমাকে ব্যবহার করে কেউ যদি টাকা দেয় তাতেও আমি রাজি। তোমরা নিশ্চয়ই সমস্যাটা বুঝতে পারছ!'

রণেন্দু উষ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি টাকার জন্য লেখেন?'

'একজন কৃষক যদি টাকার জন্যে চাষ করতে পারে আমি কেন টাকার জন্য লিখব না?' হেসে কথাগুলো বলেছিলেন তিনি।

আমরা নেমে এসেছিলাম। গ্রে স্ট্রিটের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রণেন্দু চেঁচিয়ে বলেছিল, 'আমি ভাবতে পারছি না। এই মানুষ বি টি রোডের ধারে লিখেছিল?'

পরে বুঝেছি, সমরেশদা যা বলতে পেরেছিলেন তা অনেকেই ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারেন না। মুখোশ পরে পরে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেন তাঁরা। এত স্পষ্ট কথা বলতে হিম্মতের দরকার হয়।

সমরেশদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়। আমার নাম শুনে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'আমার আসল নাম কিন্তু সুরথ। তোমার নিশ্চয়ই সে রকম কোনও নাম নেই!'

যে মানুষ একসময় কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন, যাঁর জীবন শুরু হয়েছিল চটকলের নীচের দিকের কর্মী হিসাবে, বয়সে বড় মহিলাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন যিনি বালক বয়সে, তাঁর জীবন কোথায় গিয়ে শেষ হত সেটা চটকল অঞ্চলে গেলে বোঝা যায়। সেই স্বাভাবিক শেষ হওয়াটাকে লাথি মেরে উলটে দিয়ে তিনি ক্রমশ সেই জায়গায় পৌঁছলেন যে জায়গাটা বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণের পর খালি ছিল। আর এই উত্তরণের পথটা ছিল ঠিক তার নিজের মতো। বাঙালিয়ানার নামগন্ধ তাতে ছিল না। পাতি মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা একটি মানুষ যখন সমরেশ বসু হন তখন আপসোস হয় এই ভেবে যে ইউরোপের কোনও দেশে জন্মালেন না কেন!

সমরেশদা কমিউনিজমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জেলেও গিয়েছেন। কিন্তু দলীয় নেতাদের আচরণ তাঁর মোহভঙ্গ করতে সাহায্য করেছিল। ভাগ্যিস করেছিল। ননী ভৌমিকের কথা মনে পড়ছে। কী সম্ভাবনা নিয়ে শুরু করে শেষপর্যন্ত মস্কোতে বসে অনুবাদ করে গেলেন। কিন্তু সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গ ত্যাগ করলেও মার্কসবাদে আস্থা হারাননি। প্রায়ই তাঁর লেখায় এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। যতই বলুন টাকার জন্য লিখি কিন্তু কখনও সখনও

অভিমানী হলেও পরিচয় পত্রিকায় লিখে গেছেন।

সমরেশ বসুর সব লেখা যখন আমি পড়ে ফেলেছি তখন ওঁর সঙ্গে পরিচয় হল। আমি লক্ষ করেছি ওঁর প্রতিটি লেখার বিষয় আলাদা, ভঙ্গী এবং ভাষা বিষয় অনুযায়ী বদলে যাচ্ছে। বয়স বিচারে আমাদের মধ্যে প্রচুর তফাৎ। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর সেটা একদম বুঝতে দেননি। আমি এখনও মনে করি সমরেশদাকে কেউ সম্পূর্ণ দেখে ওঠেননি। ওঁর একটা দিকের সঙ্গে আর একটা দিকের কোনও মিল নেই।

ধরা যাক, নৈহাটিতে গিয়েছি। স্টেশন থেকে বেরিয়ে সমরেশদা বললেন, 'চল চা খাই।' একটি অতি সাধারণ রেস্টুরেন্টে বসলাম আমরা। দোকানের সবাই ওঁর চেনা। দু-পা দূরে যাঁর বাড়ি তিনি কেন দোকানে চা খাওয়াবেন? প্রশ্নটা করতেই নিষ্পাপ মুখে তিনি বললেন, 'সে আসবে।' সমরেশদার বয়স তখন পঞ্চাশের মুখে। সে কে? না কলেজে পড়ে। নৈহাটির পরের স্টেশনে থাকে। কলকাতা থেকে ফেরার পথে এখানে সমরেশদার সঙ্গে দেখা করে যাবে। শুনে আমি রোমাঞ্চিত। কিন্তু সে এল না। এল তার ভাই। বাচ্চা ছেলেটি একটা চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। মুহূর্তে সমরেশদা যেন সতের বছর বয়সে চলে গেলেন। সেই বয়সের মুখ করে নিঃশ্বাস ফেললেন, 'চল'।

'এলো না?'

'না। জ্বর হয়েছে। কখন যে ঠান্ডা লাগাল!'

তারপর বাড়িতে গিয়ে বড়বউদি, ছেলের বউ, বাচ্চার সঙ্গে হইচই করে মদ্যপান করতে বসলেন। যেন এক মুহূর্তেই দুটি পর্ব পেরিয়ে অনেক দূরে চলে গেলেন।

ওই মেয়েটি, যার আসার কথা ছিল সে হয়তো আর কখনও আসেনি। কিন্তু সমরেশদার গল্পে সে এসেছিল। এই যে জীবন ছেঁকে দেখা, অমৃত পেতে বিষ গলায় নেওয়া, বারংবার সমরেশদা একই প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন। পৃথিবীর কোনও কিছুই তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি।

একজন লেখকের ব্যক্তিগত জীবন তাঁর লেখায় প্রকাশ পাবে, অন্তত

আবছাভাবেও, এটা অনেকেই মনে করেন। কিন্তু জীবনটাকে যে গিলে হজম করে ফেলে তাঁর ক্ষেত্রে সম্ভবত এই মন্তব্যটা প্রয়োগ করা যায় না। সমরেশদার জীবন শুরু হয়েছিল অনেক নিচুতলা থেকে। সেখানকার মানুষদের তিনি দেখেছেন। চটকলের কর্মী সমরেশ বসু জীবন দেখতে দেখতে অনেক ওপরের স্তরে চলে গিয়েছিলেন। একসময় নিয়মিত ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতেন। তারপর কলকাতায় বাসা নিলেন। শেষপর্যন্ত অভিজাত অঞ্চলে ফ্ল্যাট। এই যে উত্তরণ, টাকা এসেছে এবং নিজেকে পালটেছেন কিন্তু কখনওই নিজের স্থায়ী বিন্দু থেকে সরে যাননি।

পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে দার্জিলিং-এ ওঁর সঙ্গে দেখা। পরণে স্যুট, মাথায় টুপি। পুরোদস্তুর সাহেব। উত্তমকুমারের মতো ওঁর হাসি আকর্ষণীয় ছিল। বললেন বিকেলে তৈরি থাকতে, আমায় নিয়ে এক সাহিত্যসভায় যাবেন। বিকেলে সেখানে যাওয়ার পথে বললেন, 'বেশী ভেতরের দিকে বসো না। দরজার কাছাকাছি থেকে রাস্তার দিকে নজর রেখো।' সাহিত্যসভায় অনেক গুণমুগ্ধ পাঠক পাঠিকা ছিলেন। তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন সমরেশদা। আমাকে তখন কেউ চেনে না। আর আমি ভাবছিলাম সমরেশদা কেন ওই কথাগুলো বলে গেলেন। একজন অধ্যাপিকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি গঙ্গার মতো উপন্যাস লিখেছেন, আর একটা গঙ্গা লিখছেন না কেন?'

সমরেশদা গৃহকর্তাকে নিচু গলায় কিছু বলতেই তিনি সসম্ভ্রমে তাঁকে পাশের দরজায় নিয়ে গেলেন। সবাই বুঝল তিনি টয়লেটে গেছেন এবং ফিরে এসে জবাব দেবেন। হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম বাড়ির সামনের পাহাড়ী রাস্তাটা যেদিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে সমরেশদা দাঁড়িয়ে আমাকে হাত নেড়ে চলে আসতে বলে হাঁটা শুরু করলেন। একঘর অপেক্ষায় থাকা মানুষদের এড়িয়ে আমি ছুটলাম। বেলভিউ হোটেলের কাছে ওঁকে ধরতে পারলাম। 'চলে এলেন কেন?' সমরেশদা মুখ বিকৃত করে বললেন, 'কেন গঙ্গা লিখি না! যেন আমার দায় সারা জীবন একটার পর একটা গঙ্গা লিখে যাওয়ার। সেই গঙ্গা নেই, তার মাঝিরাও নেই তবু আমাকে গঙ্গা লিখতে হবে? এ রকম নির্বোধ কথা

শোনার চেয়ে চলে আসা ভাল। তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

আমরা ততক্ষণে জলাপাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলাম। রাত নেমে গেছে। জিজ্ঞাসা করতেই সমরেশদা সেই হাসিটি হাসলেন, 'আর বোলো না। খুব দেরী হয়ে গেছে। মেমসাহেব এতক্ষণে ক্ষেপে লাল হয়ে গেছেন।'

মেমসাহেব সুদর্শনা, দীর্ঘাঙ্গিনী, প্যান্ট জ্যাকেট পরণে, বিদেশী পারফিউম তাঁর চারপাশে বলয় তৈরি করেছে। অনুযোগের পর ট্রলিতে এক জার সাদা রাম আনালেন। এই বস্তুর জন্ম নাকি জামাইকায়। জারের নীচে কল রয়েছে যেখানে ঈষৎ চাপ দিলেই গ্লাস ভরে যায়। কিছুক্ষণ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম একা। মধ্যরাতে আমাদের হোটেলে সমরেশদা এসে হাজির। তখন দার্জিলিং কুয়াশায় মোড়া। প্রচন্ড ঠান্ডা। বিছানা থেকে উঠে আপাদমস্তক মুড়ে আমরা বাইরে আসতেই সমরেশদা অভিযোগ করলেন, কেউ একজন তাঁর পেছনে পেছনে আসছে। ওই ঠান্ডায় কোনও প্রাণীকে দেখতে পেলাম না। উনি উঠেছিলেন, নীচের হোটেল স্যানোটোরিয়ামে। অনেকটা নীচে। ওঁকে ধরে ধরে নামাতে হচ্ছিল। হঠাৎ সেই শীতার্ত রাত্রে উনি দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর জড়ানো স্বরে বললেন, 'কিছুই পারলাম না। তারাশঙ্করের মতো একটা লাইনও লিখতে পারলাম না। কিছুই হল না। জীবনটা এত ছোট!'

তারাশঙ্করের লেখা কবির ওই গান সমরেশদার খুব প্রিয় ছিল। হোটেলের দরজা খুলিয়ে তাঁকে বিছানায় পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম রাত দুটোয়। আর ঘুম আসেনি। সূর্যোদয় দেখব বলে জেগেছিলাম। আমাদের ঘরের ব্যালকনি থেকে নীচের হোটেল দেখা যায়। ভোর সাড়ে পাঁচটায় আবিষ্কার করা গেল ওই হোটেলের একটি ঘরে আলো জ্বলছে, একজনের ছায়া দেখা যাচ্ছে নড়াচড়া করতে। ঘরটি সমরেশদার অনুমান করে হাজির হয়েছিলাম তখনই। আবার দরজা খুলে দিয়েছিল বিরক্ত দরোয়ান। সমরেশদার ঘরের দরজায় শব্দ করতে তিনিই সেটা খুললেন। দেখলাম ওই ভোরে তাঁর স্নান সারা। পরনে পাজামা পাঞ্জাবী শাল, হাতে কলম। লিখতে বসেছেন। আমাদের দেখে খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কান্ড? তোমরা? মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলে নাকি?'

এর অনেক অনেক বছর পরে ডুয়ার্সের মধু চা বাগানে ডিসেম্বরের রাত্রে আমরা জড়ো হয়েছিলাম। সমরেশদা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বিমল দেব আর আমি। সেই রাত ছিল সমরশেদার জন্মদিন। হঠাৎই সেটা খেয়াল হতে আমরা ওঁকে ধরলাম গান শোনাতে। উনি গেয়েছিলেন সেই একই খেদ নিয়ে, জীবন এত ছোট কেনে?

লেখালেখিতে নিজেকে ভেঙেছেন যিনি নির্মমভাবে, জীবনটাকেও তাই করতে চেয়েছিলেন। এই করতে গিয়ে এদেশে যে বদনাম কুড়োতে হয় তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। প্লেনে উড়ে গেলে তো কিছুই দেখা হল না, পছন্দের স্টেশনে থেমে থেমে যাওয়ার স্বাধীনতা একমাত্র ট্রেনেই মেলে। ওঁর জীবনে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা ওর প্রয়োজনেই এসেছিলেন বলে আমার ধারণা। একেবারে শেষদিকে যাঁর প্রতি তাঁর অনুরাগ এল তিনি বয়সে অনেক ছোট। তবু ওঁর তাঁকে নিজের ভাবতে অসুবিধা হয়নি। যখন ধাক্কা খেলেন তখন যন্ত্রণা পেয়েছেন।

হয়তো এসবের মধ্যে অনেকে বাড়াবাড়ি দেখতে পেয়েছেন। দেশ পত্রিকায় তাঁর অসমাপ্ত শেষ লেখা সমস্ত সমালোচনা থামিয়ে দিয়েছিল। সত্যিকারের প্রতিভাবান মানুষকে যাঁরা চাল ডাল নুন দিয়ে মাপতে চান তাঁদের মুর্খ ছাড়া আর কী বলা যায়? কিন্তু এ কথা মানতেই হবে সমরেশদা তাঁর অনুজ লেখকদের সম্মান যেমন পেয়েছেন তেমনই অগ্রজদেরও। বুদ্ধদেব বসু বা সন্তোষকুমার ঘোষের ভূমিকার কথা ভোলা যাবে না। অথচ এই সন্তোষকুমারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোনও কারণে নষ্ট হয়েছিল। সে সময় তিনি একটি পত্রিকার সম্পাদক। সন্তোষকুমারের একটি লেখা দপ্তরের কর্মীর অসাবধানতায় হারিয়ে গিয়েছিল। ওঁর নাম শুনলেই সন্তোষকুমার গালাগাল দেন। মুখ দেখতেও চান না। অথচ আমি বুঝি মানুষটার জন্যে সন্তোষকুমারের মনে অসীম মমতা আছে। সেই কোনকালে অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্যে কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতস্থ সমরেশদাকে মধ্যরাতে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়েছেন সন্তোষকুমার। প্রথমে তাঁকে তারপর সমরেশদার ফেলে দেওয়া কয়েক হাজার টাকার বেয়ারার চেক তাঁর স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলেছেন, 'সাবধানে রেখ।' আমি ঠিক করলাম দুজনকে মেলাবো। অনেক চেষ্টার পর

সমরেশদাকে রাজি করালাম সন্তোষদার অফিস ঘরে আসতে। সমরেশদা এলেন। সেসময় একজন মহিলা কবি সন্তোষদার টেবিলের উলটোদিকে বসেছিলেন। সন্তোষদা হঠাৎই সেই কবির সঙ্গে গল্প করতে এমন মত্ত হয়ে উঠলেন যে সমরেশদাকে যেন লক্ষই করলেন না। বুঝলাম এই আচরণে সমরেশদা অস্বস্তিতে পড়েছেন। সন্তোষদাকে মনে করিয়ে দিতে তিনি বললেন, 'ও হ্যাঁ। একটা গল্প হারিয়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে, আর একটা গল্প চাইলেই তো হত। আর হ্যাঁ, টানাপোড়েনটা আর একবার পড়লাম। বাংলা সাহিত্যে কারও হিম্মত ছিল না ওই উপন্যাস লেখার। হ্যাঁ, তোমাকে যেন কি বলছিলাম?' মহিলা কবির দিকে তাকালেন তিনি। সমরেশদার মুখে হাসি ফুটল। তিনি নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম পাঁচজন ঔপন্যাসিকের একজন হওয়া সত্ত্বেও সমরেশদার জীবনের শেষদিকে অন্যরকম অস্বস্তি বেড়েছিল। কিছুই লেখা হচ্ছে না, যদি পাঠক তাঁকে ভুলে যায়! আর এই সময় তিনি একটু কানপাতলাও হয়ে যান। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে ফেলেন। আমার পুরস্কার প্রাপ্তির কারণে বইমেলার অনুষ্ঠানে যিনি দর্শকদের বলতে পারেন, 'আমার আগে যদি কোন লেখক সমরেশ বসু নামে লিখতেন তাহলে আমি ওই নাম কিছুতেই ব্যবহার করতাম না। সমরেশ সেটা পেরেছে।' সেই সমরেশদাই কারও কথায় প্রভাবিত হয়ে বিরূপ কথা লিখলেন একদিন। পড়ে কষ্ট হল। কিন্তু ওঁর কাছে গেলাম। বললেন, 'কে যে কি মাথায় ঢোকাল, অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

না। আমি অবাক হয়েছি অন্য কারণে! ওঁর চলে যাওয়ার পর অনেকগুলি বইমেলা চলে গেছে। শুনতে পাই, ওঁর বই নাকি তেমন বিক্রি হচ্ছে না! কেন? এর চেয়ে লজ্জা আর আমরা কিসে পেতে পারি? স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষার সেরা লেখককে যদি বাঙালী পাঠক ভুলে যায় তার চেয়ে অন্যায় আর কিছু নেই।

তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন গ্রন্থাবলীতে বেঁচে

আছেন। ঠিক যেভাবে অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিস্মৃতিতে চলে যাচ্ছেন সমরেশদা কি এখন সেই পথে? দুজন ব্যতিক্রমী লেখকের কথা জানি। প্রথমজন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত্যুর কয়েক বছর পর থেকে হঠাৎ দেখা গেল বাঙালী পাঠক ওঁর বই কিনতে শুরু করেছে। বই বিক্রির বাজারে হঠাৎ তিনি হটকেক। এই চাহিদাটা সম্ভবত এখনও রয়েছে। দ্বিতীয়জন সৈয়দ মুজতবা আলি। শরদিন্দুর মতো না হলেও তাঁর বই ভাল বিক্রি হয়েছিল মৃত্যুর পরে। বিশেষ করে গ্রন্থাবলী। বিশেষজ্ঞরা এর কী ব্যাখা দেবেন জানি না, কিন্তু শুধু পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা নয়, যাঁর রচনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে পাঠক আবার তাঁকে নতুনভাবে আবিষ্কার করবে এই বিশ্বাস মনে না রাখলে লেখালেখি করতে অস্বস্তি হয়।

ঈশ্বর কখনও কখনও কারও ক্ষেত্রে অকৃপণ হন। অথবা এমনও বলা যেতে পারে, দিয়ে দিতে পারলে ঈশ্বর হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। মুশকিল হল, এতটা যিনি পেলেন অথবা অর্জন করলেন তিনি তা ব্যবহার করবেন কিভাবে? যে ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের ছিল তা সন্তোষকুমারের ছিল না। এই ক্ষমতা গোছানো সংসারীর। এই ক্ষমতা বুদ্ধি দিয়ে প্রয়োগ করার। রবীন্দ্রনাথ যাঁর রক্তে, হৃদয়ে, নিঃশ্বাসে তিনি রইলেন পথভোলা বাউন্ডুলে হয়ে। রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ একটা মোমবাতিকে দশটা টুকরো করে একসঙ্গে জ্বালিয়ে গিয়েছেন। সেই মোমবাতির আগুনটার নাম দেওয়া যেতে পারে, অভিমান।

জলপাইগুড়ির বাবুপাড়া পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান সুনীলদা আমাকে এক বিকেলে বলেছিলেন, 'এখন তুই সন্তোষকুমার ঘোষ পড়। এই নে কিনু গোয়ালার গলি।'

খুব ভাল লেগেছিল। তারপর মোমের পুতুল। এর পাশাপাশি একটার পর একটা ছোট গল্প। একদিকে নারায়ণবাবু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র অন্যদিকে সন্তোষকুমার। আমাদের দিনরাত এক হওয়ার জোগাড়।

কেন জানি না কলকাতায় পড়তে এসে সন্তোষকুমারের লেখার সঙ্গে

সম্পর্ক আলগা হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি সাংবাদিক। একটার পর একটা কলম লিখছেন। সেসব দুর্ধর্ষ লেখা ঝানু সাংবাদিক ছাড়া লেখা সম্ভব নয়। আনন্দবাজারে তিনি তখন বিশেষ ক্ষমতায়। যাবতীয় তরুণ লেখকদের ডেকে চাকরি দিচ্ছেন। এমনও হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা মিথ্যে কথা বলে বাড়িয়ে একজন প্রাবন্ধিক ওঁর মারফৎ চাকরি পেয়েছিলেন। পরে আনন্দবাজারের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের চাপে স্বীকার করতে বাধ্য হন। এসব ক্ষেত্রে চাকরি থাকার কথা নয়। কিন্তু ওঁর লেখা সন্তোষকুমারের ভাল লাগায় তাঁকে এক বছর সময় দিয়েছিলেন শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে। সন্তোষকুমার চাননি এই কারণে সেই তরুণ লেখক কৃতজ্ঞ হোক। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর আচরণ ওঁকে ব্যথিত করেছিল।

সাংবাদিক সন্তোষকুমার সাহিত্যিক সন্তোষকুমারের ক্ষতি করেছিল। দীর্ঘকাল তিনি লেখেননি। আবার যখন লিখলেন তখন শেষ নমস্কারের মতো উপন্যাস তাঁর হাত থেকে বের হল। নিজের সর্ম্পকে প্রচন্ড আস্থা তাঁকে ক্রমশ অভিমানী করেছিল। আমি ওঁকে দেখেই শিখেছিলাম, ক্রোধ যতটা অভিমান তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী।

'দেশ'-এ উত্তরাধিকার লিখছি। হঠাৎ চিঠি। 'এযাবৎ যা পড়েছি তাতে মনে হয়েছিল আপনি বাংলা সাহিত্যের ঘোড়দৌড়ে অলসো র‍্যান ঘোড়া। এই লেখা পড়ে চমকে উঠলাম। দয়া করে দর্শন দেবেন? সন্তোষকুমার ঘোষ।'

আনন্দবাজারের চারতলায় তিনি বসতেন। সেখান যাওয়ার প্রয়োজন হত না। আমি যেতাম দেশে বিমলদার কাছে, রবিবাসরীয়তে রমাপদদার কাছে এবং পরে সাগরদার চেম্বারে। সন্তোষকুমার একজন কড়া মানুষ, সেইসঙ্গে উন্নাসিক এরকম ধারণা প্রচারিত ছিল। তবু ভয়ে ভয়ে গেলাম। উনি তখন ডিকটেশন দিচ্ছিলেন। আমার পরিচয় শুনে হাত নেড়ে বসতে বললেন। কাজ শেষ হলে বললেন, 'চল'।

আদেশ অমান্য করার সাহস ছিল না। ওঁর গাড়িতে রবীন্দ্রসদনে পৌঁছলাম। পথে একটাও কথা বললেন না। সেই সন্ধ্যায় ছিল সুচিত্রা মিত্র এবং কণিকা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠান। ওঁর পাশে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। শেষ হওয়া মাত্র বললেন, 'চল'।

রবীন্দ্রসদন থেকে সোজা রাতদিন হোটেলে। আমি খাই কিনা না জিজ্ঞাসা করেই মদের হুকুম দিলেন। তারপর বললেন কথা। ওই প্রবীণ মানুষটি যে আমার প্রায় সব লেখা পড়েছেন তা জেনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেসব লেখাকে কচুকাটা করে তিনি উত্তরাধিকার নিয়ে কথা শুরু করলেন। সেই রাতে বাড়ি ফিরে খুব উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম।

তারপর প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় ওঁর সঙ্গে দেখা হত। ওঁর কথা আমি গিলতাম। একটি মানুষ শুধু কথা বলে যাচ্ছেন আর আমি সেইসব কথায় একটার পর একটা গল্প পেয়ে যাচ্ছি। সেই সব গল্প লিখছি দেশ পত্রিকায়। আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত গল্পটি তো আমি শুধু সাজিয়ে দিয়েছি। যে ভাষায় তিনি ভাবতেন, বলতেন, লিখতেন সেই নতুন আঙ্গিকের বাংলাভাষা যাকে অনেকেই অনাবশ্যক জটিল বলত, আমি ভ্রমণবৃত্তান্তে অনুকরণ করেছিলাম।

একথা ঠিক সন্তোষকুমার তাঁর লেখার ভাষায় জটিলতা এনেছিলেন। সম্ভবত সেই কারণে তিনি পাঠকদের কাছে পাননি। এটা তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের কথা। তখন কেউ যদি কিনু গোয়ালার গলির প্রশংসা করত খুব রেগে যেতেন।

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং সমালোচনা কোনটাতেই তাঁর জড়তা ছিল না। তিনি লিখছেন না বলে নিয়মিত আমার সঙ্গে ঝগড়া হত। সেসব ঝগড়ার পর এক রাতে অনবদ্য ছোটগল্প লিখে ফেলে শিশুর মত হাসতেন, 'তুমিই লেখালে।' আবার আমার পুজোসংখ্যায় বেরনো উপন্যাস রাতেই শেষ করে ভোরবেলায় চলে এসেছেন বাড়িতে। আমাকে ঘুম থেকে তুলে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলেছিলেন, 'কি লিখেছিস রে! তোর মতো গবেটও এমন লিখতে পারে! দাবা বের কর।'

সেই ভোর থেকে টানা দাবা খেলে গেলেন দুপুর পর্যন্ত। স্নান খাওয়া নেই। খেতে বললে নামমাত্র খেলেন। তারপর আমাকে নিয়ে বের হলেন।

সোজা মিনার্ভা বারে। সেখানে বসে কী কী লেখার পরিকল্পনা মাথায় ঢুকেছে সেগুলো জানালেন। তারপর বললেন, 'চল'।

আমরা গেলাম হাজরা রোডের একজন মহিলা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর বাড়িতে। সেখানে তাস খেলা হচ্ছিল। লক্ষ করেছি সন্তোষকুমারকে পেলেই যে কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। গোটা গীতবিতান যার মুখস্থ, স্বরবিতানের কোন পাতায় কোন স্বরলিপি আছে যিনি বলে দিতে পারেন, সুরের সামান্য বিচ্যুতি যাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে তাঁকে আপনজন ভাবা স্বাভাবিক। সন্তোষদা তাসে জমে গেলেন। এই সময় এক মধ্যবয়সী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ঘরে ঢুকে বললেন, 'ছি ছি সন্তোষদা, আপনি এটা কি করেছেন? আপনি লিখেছেন, একটা জাহাজ যখন ভোঁ বাজিয়ে জাহাজঘাটা ছেড়ে চলে গেল ঠিক তখনই একটা মেল ট্রেন সদর্পে হুইস্‌ল দিয়ে পাশের স্টেশনে ঢুকল? আপনি কিছুতেই ওঁকে এভাবে অপামান করতে পারেন না।'

সন্তোষদা বললেন, 'তুমি বয়সে অনেক ছোট, বড়দের বিষয়ে কথা বলো না।'

'আলবাৎ বলব।' চেঁচিয়ে উঠেছিলেন সেই গায়ক।

সন্তোষদা তবু উপেক্ষা করে তাস খেলতে শুরু করলেন। এই সময় সেই প্রবীণা শিল্পী ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গায়ককে সমর্থন করে গালাগালি দিতে শুরু করলেন। যাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ জেগে ওঠেন তাঁকে ওই ভাষায় কথা বলতে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সন্তোষদা তাস রেখে আমায় বললেন, 'চল'। খেলার সঙ্গীরা বাধা দিতে চাইল, তিনি শুনলেন না।

সেই রাত্রে অনেকটা সময় আমি ওঁর সঙ্গে ছিলাম। লক্ষ করেছিলাম প্রবীণা যখন আক্রমণ করেছিলেন তখন সন্তোষদা একটি কথাও বলেননি। অনেকটা পান করার পর তিনি বলেছিলেন, 'ওইসব শব্দ আমি কয়েকযুগ ধরে ওঁর মুখে শুনে আসছি। একবার পাক-পাড়ায় বাড়ির বসার ঘরে সবাই আড্ডা মারছি। পর্দার নিচ দিয়ে দেখলাম লুঙ্গি পরে কেউ যাচ্ছে। উনিও দেখেছিলেন। কিন্তু লুঙ্গিকে শাড়ী ভেবে নিয়ে আমাকে তোমার বউদির সামনেই গালাগাল করেছিলেন।

ভেবেছিলেন আমি রাস্তার মহিলাকে দেখছি।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন এমন হয়?

উনি বলেছিলেন, 'ভালবাসা বন্যার মতো। যতক্ষণ নদীতে তীব্র স্রোত থাকে, সব ভাসায় কিন্তু নদী নিজে ভাসে না। যেই বন্যার জল নেমে যায়, নদী থাকে তাবই মতো। শুধু দুপাশের চরাচর ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে থাকে। পলি জমে জমে নিস্ফলা হয়। ভালবাসলে ওই ক্ষতচিহ্নগুলো তোমাকেঁ বইতেই হবে। আর কে বলতে পারে, হয়তো ওই ক্ষতচিহ্নগুলো আছে বলে ভালবাসা মনে থাকে।'

'তার মানে বন্যার স্মৃতি নদী বহন করে না?'

'না। সেটা খুঁজতে তোমাকে নদীর দুপাশে তাকাতে হবে। মুশকিল হল, কেউ কেউ ওই ক্ষতগুলো নিয়ে বসে থাকতে ভালবাসেন সারাজীবন, ভুল করেও শান্ত হয়ে যাওয়া নদীর দিকে তাকান না। তাই তাঁদের মুখ থেকে পাঁক বেরিয়ে আসে। আর কে না জানে যে সুন্দর করেছে, পঙ্কিল করার অধিকার তারও আছে।'

অদ্ভুত এক অন্ধকারে ছটফটিয়ে আপনবৃত্তে থাকা রাজার মতো মনে হত সন্তোষদাকে। আর তাই বারংবার হাত বাড়িয়েছেন উষ্ণতা খুঁজতে, যে উষ্ণতা একমাত্র আলোই দিতে পারে। তাই তাঁকে শুনতে হয়েছে, রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারি না। রক্তকরবীর রাজার সঙ্গে শাপমোচনের রাজার যেখানে মিল সেখানেই তিনি। বারংবার তাঁকে দেখি একটি ছোট্ট ঘাসের দিকেও হাত বাড়িয়ে বলছেন, আমি বাঁচতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঈশ্বর, একমাত্র ঈশ্বর। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীরা তাই তাঁর আত্মীয়। কেউ কেউ তাঁর আত্মায় মিশেছিলেন। পূজার গান যতটা ভালবাসতেন প্রেমের গান কম নয়। বলতেন, 'প্রেম ছাড়া পুজো হয় নাকি? আর প্রেমে যদি পুজো না থাকে তাহলে প্রেম কিসের?'

'দেশ'-এ মাঝে মাঝে ছোটগল্প বের হচ্ছে। আনন্দবাজারের চার তলার বন্ধ ঘরে বসে অভিমানের পাহাড় তৈরি করেছিলেন, আমার তাড়নায় মাঝে

মাঝে সেই লেখা। বেশির ভাগই দার্শনিকের চোখে জীবন দেখা। অনবদ্য ভাষা, কিন্তু গল্প কোথায়? প্রশ্ন করতেই সেটা জানিয়ে তাঁর আগের গল্পগুলোর কথা মনে করিয়ে দিতাম। তিনি বলতেন, লিখব, লিখব। অথচ আনন্দলোক পত্রিকার সম্পাদকের আমন্ত্রণে উপন্যাস লিখলেন মাত্র নয় পৃষ্ঠার। খুব রাগারাগি হয়েছিল সেটা শোনার পর। ন'পাতার উপন্যাস! বললেন, 'ঠিক আছে, এবার সংসারী হব, গুছিয়ে লিখব।'

কালবেলা উপন্যাসটি তাঁকে উৎসর্গ করেছিলাম। সেটা দেখে তিনি আঁতকে উঠেছিলেন, 'ইস্। করেছ কি? যার লেখা বই একদম বিক্রি হয় না তাকে উৎসর্গ করেছ? এই বই-এর বারোটা বেজে গেল।'

কখনও কখনও রাতে লিখতাম। লিখতে গিয়ে মনে পড়ছিল না উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়ি থেকে বাঁ দিকে যে রাস্তা চলে গিয়েছে তার প্রথম গঞ্জটার নাম কি? সেই গভীর রাতে ফোনে প্রশ্নটা করেছি, তিনি এক মুহূর্ত্ত সময় না নিয়ে বলেছেন, 'লাটাগুড়ি'। বলে নামিয়ে রেখেছেন ফোন। এরকম অজস্র প্রশ্ন যা হাতের কাছে কোনও প্রমাণ না পেয়ে তাঁর দারস্থ হয়েছি আর সঙ্গে সঙ্গে সঠিক জবাব পেয়েছি। এখন পর্যন্ত এইরকম জ্ঞানভান্ডার আমি কোনও বাঙালির দেখিনি।

আমেরিকায় যাচ্ছিলেন। আমার বন্ধু মনোজ ভৌমিক কুইন্সে থাকে। ও লেখালেখি করে শুনে বললেন, টেলিফোন নাম্বার দাও, ওর কাছে ক'দিন থাকব। দিলাম। চলে যাওয়ার পর মনোজকেও জানিয়ে দিলাম। মনোজ খুব উত্তেজিত। মাস খানেক পরে মনোজের ফোন এল, 'সমরেশ। একটু আগে সন্তোষবাবু ফোন করেছিলেন ওয়াশিংটনের এক হোটেল থেকে। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমরেশ নামক এক অবচীন কি আপনার পরিচিত? সে কি আমার কথা কিছু বলেছে? আমি হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু উনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'একটু ধরুন'। প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে তিনি ফিরে এসে বললেন, 'সরি। আসলে আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় দেখতে পেলাম দুর্গাঠাকুরের মতো দেখতে এক মেমসাহেব কিছুটা দুর দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে কাছ থেকে

দেখে এলাম। মনোজ, আপনি কখনও দুর্গাঠাকুরের মতো মেমসাহেব দেখেছেন?'

সমরেশ লং ডিসটেন্সে যিনি এমন কথা বলতে পারেন তাঁর সঙ্গ পাওয়ার জন্যে আমি ছটফট করছি।'

গভীর মনের মহিলারা তাঁর কাছে এগিয়ে গেলে সন্তোষদা আপ্লুত হতেন। মুখোমুখি বসে শুধু কথা বলে যেতে তিনি নিজে যত আনন্দ পেতেন তাঁর শ্রোতা অনেক বেশী পেত এতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর আচরণ কখনওই শোভনসীমার বাইরে যেত না। এটা না বুঝে এক মহিলা প্রায় প্রাত্যহিক প্রেমপত্র পাঠাতে আরম্ভ করলেন। ভদ্রমহিলা শেষপর্যন্ত লিখতে আরম্ভ করলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন সন্তোষদা বিবাহিত নন, ছেলেমেয়ে হয়নি। তাঁর অফিসে ঢোকার অনুমতি বাতিল করেছিলেন সন্তোষদা। কিন্তু কলকাতার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা মানেই তো সন্তোষদার উপস্থিতি। মহিলা সেখানে উপস্থিত হতেন। বিব্রত না হওয়ার জন্যে সন্তোষদা কখনও কোনও সঙ্গী ছাড়া অনুষ্ঠানে যেতেন না। জীবন বড় রহস্যময়। এই মহিলার সম্পর্কে জানতে চেয়ে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। জেনেছি ইনি আমাদের সেই সহপাঠিনী যিনি নারায়ণবাবুতে অনুরক্ত ছিলেন। এদেশের নিয়ম অনুযায়ী কোনও নারীর একজন পুরুষের প্রেমে মগ্ন থাকা কর্তব্য। পুরুষের ক্ষেত্রে সেসব নিয়ম মানার দরকার নেই। এই মহিলা সেই নিষেধ উপেক্ষা করেছিলেন। সন্তোষদা এই প্রাবল্যে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। শুধু চিঠি লিখে যাওয়া ছাড়া মহিলা অবশ্য আর কোনও সমস্যা তৈরি করেননি।

এই শহরের কে না বন্ধু ছিল তাঁর? শম্ভু মিত্রের মত মানুষও তাঁর সঙ্গ চাইতেন। আবার তৃপ্তি মিত্র তো খুবই কাছের মানুষ। একবার এই দুজনকে নিয়ে বসতে চেয়েছিলেন সন্তোষদা। শেষ মুহূর্তে বিফল হন।

গলা নিয়ে অস্বস্তি ছিল। যখন অসুখটা ধরা পড়ল তখন একদিন তাঁকে বলতে শুনলাম, 'না। আমার কোনও আক্ষেপ নেই। জীবন শুরু করেছিলাম অন্যের নামে বই লিখে দিয়ে। সেই একটি মাত্র রবীন্দ্র বিষয়ক বই ওই পরলোকগত সম্পাদককে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার যা লেখা উচিত ছিল তার কিছুই লিখতে পারিনি। এর জন্য দায়ী আমি। সাংবাদিক হিসেবে কিছুটা কাজ করতে

পেরেছি এটুকু বলতেই হবে তোমাদের। রবীন্দ্রনাথের গান শুনেছি প্রাণভরে। নারী আমার জীবনে এসেছে। তারাও তৃপ্ত হয়নি, আমিও না। জীবনে একটি নারীর কাছেই আমি এগিয়ে গিয়ে জল চেয়েছিলাম। তাঁকে হয়ত সারাজীবন মরুভূমির ঝড় সইতে হচ্ছে। কিন্তু তিনি ক্ষমা করতে জানেন, ক'জন জানে? এই অসুখ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হয়েছিল। এর চেয়ে ভাল হওয়া আমার আর কিসে হত? না। আমার কোনও আক্ষেপ নেই।'

এইসব বলার কিছুদিন পরে চিকিৎসার জন্যে মুম্বই এবং কলকাতার বেলভিউ নার্সিংহোমে ছোটাছুটির মধ্যে লিখে ফেললেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দুটো লেখা যাত্রাভঙ্গ এবং চলার পথে। ওঁর মৃত্যুর পর দেশ পত্রিকায় যখন প্রকাশিত হল তখন লেখাগুলোর প্রতিটি লাইন বাঙালি পাঠককে বিদ্ধ করেছিল।

উনি যখন শেষ সময়ে, বেলভিউতে, তখন কণ্ঠরোধ হয়েছিল। আর তখনই অনেক রাতে জানতে পারলাম, কালবেলার জন্যে আকাদেমী পুরষ্কার দেওয়া হচ্ছে। ভোরবেলায় ছুটে গেলাম নার্সিংহোমে। ওঁর মেয়ে মিলু বলল, 'যাক এসে পড়েছেন। বাবা কাগজ পড়ে ছটফট করছেন।'

উনি বসেছিলেন সাদা বিছানায়। ক্যান্সার শরীরটাকে ছোট করে দিয়েছে। আমায় দেখে হাসলেন। কথা বলতে চাইলেন, শব্দ বের হল না। তাড়াতাড়ি কাগজ-কলম নিয়ে লিখলেন, 'এক জীবনে দ্বিতীয়বার আমি আকাদেমী পেলাম।'

ওঁর শেষ সময়ে আমি দিল্লিতে ছিলাম। পুরস্কৃত হওয়ার পরের দিন দিল্লির আনন্দবাজার অফিসে গিয়ে নীরেনদার কাছে জানতে পারলাম তিনি নেই। দিল্লি যাওয়ার আগে যখন নার্সিংহোমে দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন লিখে জানিয়েছিলেন, 'তোমার পুরস্কার নেওয়াটা কি টিভিতে দেখাবে? তাহলে দেখব।'

সন্তোষদার সঙ্গে শক্তিদার পার্থক্য প্রচুর। কিন্তু কোথাও যেন খুব মিল ছিল।

চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয় মারবো পোঁদে লাথি।

ষাটের দশকের শুরুতে এরকম লাইন কানে আসামাত্র পাঠক মুখ ফিরিয়ে

দেখতে চেয়েছিল কার গলা? সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানান দিয়েছিলেন, 'এই যে মশাই, দেখছেনটা কি? আমি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিতা নয়, পদ্য লিখছি, আপনাদের বদহজম হবে।'

এই সংলাপ কল্পিত কিন্তু যুবকের প্রবেশ হয়েছিল এইভাবেই। নিয়মভাঙ্গার ঔদ্ধত্য নিয়ে যারা অশ্লীল শব্দের ঘোড়া ছুটিয়েছিল তাদের পরিচয় ছিল হাংরি জেনারেশনের লেখক। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তখন যুবক। সন্তোষকুমার বলেছিলেন শাস্ত্রবিরোধীদের সর্ম্পকে, বিরোধিতা করতে গেলে শাস্ত্রটা জানতে হয়। হাংরিদের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। তাঁদের অনেকে যখন সাহিত্যকে লাল গামছা জাতীয় বই-এ নামিয়ে আনার চেষ্টা করছেন অক্ষমতার কারণে তখনই পুলিশের ধরপাকড় শুরু হয়েছিল। একথা ঠিক এই দলের কেউ কেউ ভাল লিখতে পারতেন। কিন্তু ধ্বংস করার নেশায় তারা জ্বলেপুড়ে গেছেন। শোনা যায়, শক্তিদা নাকি পুলিশকে বলেছিলেন, আর কখনও অশ্লীল লেখা লিখবেন না। ফলে দল তাঁকে অস্বীকার করেছিল। ভাগ্যিস করেছিল।

জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতায় সবচেয়ে যিনি আকর্ষণীয় তাঁর নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এই মানুষটি কেমন? কফিহাউসে ওঁর সঙ্গে আলাপ ছাত্রাবস্থায়, কবি শংকর দে বলেছিল, 'শক্তিদা অনেকগুলো ছোট ছোট বালিশ আঁকড়ে ধরে গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে থাকেন। কথা বলেন জমিয়ে, হাসেন শিশুর মতো। এই মানুষ যখন চোয়ালে থাপ্পড় মারতে চান এবং সেটা কম হলে স্থান নির্বাচন করে লাথি মারার জন্য প্রস্তুত তখন ধন্দ লাগে। এই ধন্দ তাঁকে ঘিরে ছিল তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত।

শক্তিদার সঙ্গে সুনীল-সন্দীপনের নাম একসঙ্গে বলা হত। প্রায়ই উধাও হতেন তাঁরা। কখনও চক্রধরপুর কখনও চাইবাসায়! অমুক রিক্সাওয়ালার কাছে মালের বোতল রাখা আছে এই খবর পেয়ে কলকাতা থেকে চলল আর একজন। মহুয়া খেয়ে সুবর্ণরেখার চরে শুয়ে বুড়ি চাঁদটাকে কতবার চুমু খেয়েছি তুই জানিস না সমরেশ। খালাসিটোলা আর বারদুয়ারী, কলকাতার এই দুই ঠেকে ছিল ওঁদের সান্ধ্য আড্ডা। তারপর হয়তো সারা রাত কলকাতার দখল নেওয়া।

বেলালের কাছে শুনেছি শক্তিদা পুলিশ অফিসারকে কবিতা শুনিয়েছেন।

ভুল হল। শক্তিদা বলতেন, পদ্য। তুই গদ্যকার, আমি পদ্যকার। গদ্য লিখলে টাকা পাওয়া যায়? তাহলে লেখা যাক। কদিন বাদেই আবার, দূর! সুনীল যেটা পারে আমি পারব কেন? ওঁর লেখা পড়ে আপ্লুত হয়ে গেলাম টেবো পাহাড়ে। কোথায় সেই ঝরণা, গেস্ট হাউসের আরাম! ভোরে বাস থেকে নেমে দাঁতন করেছিলাম, মুখ ধোওয়ার জল পেলাম চক্রধরপুরে এসে। কলকাতায় ফিরেই ওঁকে ধরলাম। শিশুর মতো হেসে বললেন, 'তুই আমার গদ্য পড়িস নাকি? কি নির্বোধ রে বাবা।'

তখন শক্তিদা মানেই একটা কিছু গোলমাল। কখন কী হয়? অথচ ওঁর ওপর রাগ করা যায় না! অথচ শক্তিদা নিয়ম ভাঙবেনই। পাশাপাশি উনি লিখছেন সেইসব দারুণ দারুণ কবিতা যা নিয়ে একশ বছর পরেও বাঙালি গর্ব করবে। আমার পিতৃদেব ছিলেন খুব রক্ষণশীল মানুষ। দেশ পত্রিকা রাখতেন কিন্তু কবিতা পড়তেন না। থাকতেন ডুয়ার্সের এক চা-বাগানে। যেখানে হোটেল নেই।

এক সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে ফিরে যখন চা খাচ্ছিলেন তখন এক ভদ্রলোক এলেন বাড়িতে, 'আমি বাস মিস করেছি। এখানে কোনও হোটেল নেই। খবর নিয়ে জানলাম আপনিই শুধু 'দেশ' রাখেন। আমি পদ্য লিখি।'

পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বলুন, কি করতে পারি?'

'আমি শক্তি চট্টোপাধ্যায়।'

'বেশ তো। আপনার নাম আমি দেশে দেখেছি। আসুন।'

শক্তিদা ঘরে ঢুকে দেওয়ালে আমার ছবি দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'আরে! এতো সমরেশ। আমার ভাই। আপনার কে হয়?'

'আমার ছেলে।'

সম্ভবত আমাকে চেনার কারণে ওঁর খাতির বেড়ে গেল। মা জলখাবার পাঠালেন বাইরের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে। রাতে স্পেশ্যাল রান্না চাপল। শক্তিদা আমাদের বুড়ো মদেশিয়া কাজের লোককে নিয়ে বের হলেন বাগানটা

ঘুরে দেখতে।

এর পরের ঘটনা পিতৃদেব এইভাবে লিখেছিলেন, ‘তোমার মা জেগেছিলেন রাত একটা পর্যন্ত। তুমি জানো চা-বাগানে কেউ দশটার পর জাগে না। তিনি এলেন রাত দুটোয়। ঝাড়ি তাকে বয়ে নিয়ে এল। শুনলাম কুলি লাইনে গিয়ে হাঁড়িয়া গিলেছেন। শুধু নিজে নয়, ঝাড়িকেও খাইয়েছেন। খবরটা পরদিনই চাউর হয়ে গেল। বুঝতেই পারছ চা-বাগানে এর ফলে আমার সম্মান কতটা বাড়ল! যাহোক, তিনি চলে গেলেন পরদিন সকালে। বলে গেছেন ওঁর কবিতার বই পাঠিয়ে দেবেন। কবিতা লিখতে গেলে হাঁড়িয়াও খেতে হয় এই তথ্য আমি জানতাম না।

শক্তিদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, ‘তোদের গয়েরকাটায় যা হাঁড়িয়া পাওয়া যায়, তার তুলনা নেই।’

কি এক অশান্ত ওঁকে তাড়িয়ে বেড়াত। সংসারে ছিলেন কখনও সন্ন্যাসীর মতো কখনও স্নেহপ্রবণ পিতার ভূমিকায়। এই দুই চরিত্র একই মানুষের। কানপাতলাও ছিলেন। কেউ একজন গপ্পো বানিয়ে বলেছিল আমার প্রসঙ্গে। বিশ্বাস করে তাই নিয়ে আক্রমণ করলেন একদিন। বিশ্লেষণ করার পর চুমু খেয়ে বললেন, ‘রাগ করিস না বাবু।’

আমার কেবলই মনে হয়েছে মানুষটি একটা ঠিকানা খুঁজতে চেয়েছেন। সেই ঠিকানায় পৌঁছবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন, নিয়মের ধার ধারেননি। দিনরাত মদে ডুবে থেকেছেন কিন্তু কোন নারীর জন্যে লালায়িত হননি। যাকে বিবাহ করেছেন তাঁকেই শেষ নারী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। মেনে নেওয়া কথাটা ঠিক [illegible] যেন আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা পেয়ে গিয়েছিলেন স্ত্রীর মধ্যে, পৃথিবীর আর কোনও নারীর কাছে চাওয়ার কিছু নেই।

এইখানেই তাঁর সঙ্গে অন্য তিনজনের পার্থক্য। তিনি অতৃপ্ত নিজেকে ভেঙেছেন, বাড়ি খুঁজেছেন, অবিরত।

মাঝখানে ভিনপ্রদেশে গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্যে। চিকিৎসাটা [illegible] ছাড়ার। ফিরে এলেন বেশ কিছুদিন বাদে বেশ তরতাজা হয়ে। কফিহাইসে দেখা। জিজ্ঞাসা

করলাম, 'কেমন কাটালে?' খুব দুঃখী দুঃখী মুখ করে বললেন, 'আর বলিস না। লোকটার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'কে?'

'যাঁর কাছে গিয়েছিলাম। আমি মদ ছাড়লাম কিন্তু আমার সঙ্গে থেকে ডাক্তারটা মদ ধরল। বোঝ।'

হয়তো গল্প। আর এই গল্প তিনিই বলতে পারতেন। মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর কথা লিখেছেন নানান কবিতায়। যেন নিজের শেষটা দেখে গিয়ে লিখে গেছেন সেসব।

শেষদিকে শক্তিদাকে একটু ঝিমিয়ে পড়তে দেখেছি। বলতেন, 'বুড়ো হয়ে গেলাম। জীবনটা এত ছোট।'

চমকে উঠেছিলাম কথাটা শুনে। সমরেশদার কথা মনে পড়েছিল। আমার মুখ দেখে হেসে বলেছিলেন, 'হবে না কেন? এ বাবু বড় অভিমানী। বল্?'

নিজের মতো বেঁচে চলে গেলেন শক্তিদা।

কিন্তু সন্তোষদার সঙ্গে তাঁর মিল এক জায়গায়, সেটা অতৃপ্তি নিয়ে ছটফটানিতে। বোধহয় সমরেশদার সঙ্গেও। এই তিনজনের সঙ্গে নারায়ণবাবুর তফাৎ একটাই, তিনি মাস্টারমশাই ছিলেন, বাধ্য হয়ে শোভনসীমার মধ্যে তাঁকে থাকতে হয়েছে। এই চারজনের আর একটা মিল ছিল। চারজনেই মনে করতেন, যাঁরা অক্ষম, কিছু দেওয়ার যাঁদের ক্ষমতা নেই তাঁরাই সমালোচনা করেন। অন্তত তাঁদের চারপাশে যাঁরা সমালোচনা করেই নাম করেছেন তাঁদের সর্ম্পকে অপূর্ব উদাসীনতা ছিল এঁদের।

এই রচনার নাম দেওয়া যেত, সুন্দরের স্বেচ্ছাচার। কিন্তু সুন্দর কী, এই নিয়েই তো এঁদের মতবিভেদ। আর স্বেচ্ছাচার মানেই যে খারাপ কিছু করা এটা কেউই বিশ্বাস করতেন না। এই চারজন এখন পৃথিবীতে নেই। এঁদের সাহিত্য নিয়ে যাঁরা বলার অধিকারী তাঁরা বলবেন। কিন্তু এঁদের জীবন আমাকে ভাবায়। কইতে কথা বাধলেও বলা দরকার।

দুই

অন্যের লেখা পড়ার অভ্যেস এখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। সম্ভবত, বুদ্ধদেব গুহ কিছুটা ব্যতিক্রম। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের আগে যাঁরা লেখালেখি করেছেন তাঁদের অনেকেরই এই অভ্যেস ছিল। এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং সন্তোষকুমার ঘোষের নাম মনে পড়ছে। একজন তরুণতম লেখক কোনও অখ্যাত কাগজে ভাল কিছু লিখলে এঁরা শুধু পড়ে ফেলতেন না, মনেও রাখতেন। ভাল লাগার পরিমাণ বেশি হলে চিঠি লিখতেন। সে সময় লেখকের সঙ্গে লেখকের যেমন চাপা রেষারেষি ছিল তেমনি নতুনদের উৎসাহ দিতে ওঁদের আগ্রহের অভাব হয়নি। 'অমৃত' পত্রিকায় হঠাৎ একটি প্রবন্ধে অচিন্ত্যকুমার আমার 'দেশ'-এ প্রকাশিত গল্প নিয়ে অনেকটা আলোচনা করেছিলেন। তখনও উনি আমাকে চিনতেন না। এখন এই ব্যাপারটা চোখে পড়ে না। একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক স্বীকার করেছেন, তিনি একবার লিখে ফেলার পর আর নিজের লেখাও পড়েন না।

পড়াশোনা আর লেখালেখি পাশাপাশি না চালানোর কথা পঞ্চাশের দশকে অনেকে ভাবতেই পারতেন না। সেই পড়াশোনা হল বিদেশী গল্প উপন্যাস এবং প্রবন্ধের বই। পৃথিবীর কোথায় সাহিত্য নিয়ে কী কর্ম হচ্ছে তা জানা না থাকলে অনেক পিছিয়ে পড়তে হবে এমন একটা ধারণা চালু ছিল। এসবের কারণে লিখতে গিয়ে অনেকেই প্রচন্ড খুঁতখুঁতে হয়ে পড়তেন। প্রথম পাতা লিখতে দশ বার, অনেকটা লিখেও ছিঁড়ে ফেলতেন। এই যে লেখা নিয়ে সিরিয়াস ভাবনা তা পঞ্চাশের দশকের তরুণ লেখকদের মধ্যে শুরু হয়েছিল বিমল করকে ঘিরে।

লেখা পড়লে লেখকের সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা মেলে না। বিমল করের লেখা পড়তে আরম্ভ করি কলেজে ঢোকার পর। ওঁর প্রায় সমস্ত লেখা পড়ে ফেলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। পিয়ারিলাল বার্জ নামে একটি নাটক লিখে অভিনয় করেছি ওঁর গল্প অবলম্বনে। আমার

ধারণা হয়েছিল, মানুষটি খুব রোমান্টিক, একটু শীতকাতুরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপে যখন পড়ি তখন খবর পেলাম কলেজস্ট্রীট বাজারের ভেতর একটি চায়ের দোকানে বিমল কর রোজ আসেন। সঙ্গে তরুণ লেখকরাও থাকেন। একদিন দেখতে গিয়েছিলাম। ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরা লম্বা মানুষটি আমাকে আকর্ষণ করেছিলেন কিন্তু আলাপ করতে সাহস পাইনি।

আলাপ হল যখন দেশ পত্রিকায় ছাপা হবে বলে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরও আমার গল্প ডাকে ফেরত এল। সে সময় দেশে গল্প ছাপা মানে লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া। প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর আমি কফি হাউসে প্রায় নায়ক হয়ে গিয়েছি। গল্প ফেরত পাওয়ার পর অভিমানে, রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমে ঠিক করেছিলাম আর কখনও লিখব না। তারপরে ভাবলাম, বিমল করকে প্রচন্ড গালাগাল দেওয়ার পরই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সেই গালাগাল করতে গিয়ে জানলাম পিওনের ভুলে কান্ডটি ঘটেছে। গল্পটি দেশে ছাপা হয়েছিল সাতষট্টি সালে।

সে সময় কলেজ স্ট্রীটের আড্ডা চলে এসেছে কার্জন পার্ক এবং কে সি দাশের দোকানে। সেই আড্ডায় আমিও জুটে গেলাম। একমাত্র সুনীলদা ছাড়া সে সময় প্রায় সব তরুণ লেখককে ওখানে দেখেছি। আড্ডায় যেমন সাহিত্য নিয়ে কথা হত তেমনি রসালাপও চলত। আমার শুধু একটাই ধারণা মিলেছিল। বিমলদা শীতকাতুরে। কিন্তু প্রচন্ড আড্ডাবাজ, চা বা সিগারেটে আপত্তি নেই, হাঁটুর বয়সী লেখকদের সঙ্গে তার মতোই মিশতে পারেন। সে সময় দেশ পত্রিকার গল্প দেখতেন উনি। তাই অনেকের ধারণা ছিল আড্ডাতে ঢুকতে পারলেই দেশে গল্প ছাপা হবে। সেরকম মতলব বুঝতে পারলেই বিমলদা তাঁর সমবয়সী লেখকবন্ধু শিশির লাহিড়িকে বলতেন, 'শিশির, কাটিয়ে দে।' শিশিরদা তক্ষুনি সেই ছেলেটিকে ধমকাতেন, 'এ্যাই ছোঁড়া, তোমার কোন বান্ধবী নেই? বুড়োদের সঙ্গে সন্ধেবেলায় কেন বসে আছ। যাও, কেটে পড়।' শিশিরদাকে বিমলদা একবার আদেশ দিলেন আমাকে কাটিয়ে দিতে কারণ আমার সামনে বড়দের গল্প করা যাচ্ছে না। শিশিরদা মাথা নেড়েছিলেন, 'উরিব্বাস! বিমল, এ ছোঁড়া চলে যাওয়ার জন্যে আসেনি।'

বিমলদা খুঁতখুতে মানুষ। একটা পাতা দূরের কথা, একটা লাইনও যতক্ষণ পছন্দ না হয় ততক্ষণ লিখবেন আর কাটবেন। মনে হত, সবসময় তিনি অস্বস্তিতে রয়েছেন। এই ব্যাপারটা নিজের শরীর সম্পর্কেও। আটষট্টি সালে শুনেছিলাম ওঁর দাঁতে খুব যন্ত্রনা হচ্ছে, গলায় ব্যাথা। একদিন জানালেন, ক্যানসার হয়েছে। দু'হাজার সালেও সেই কল্পিত ক্যানসার একই জায়গায় থেকে গেছে। কিন্তু ভুগেছেন খুব। আর তার প্রতিফলন পড়েছে ওঁর লেখায়। কে যেন বলেছিল, বিমল করের লেখা মানে, কম্ফর্টার, মোজা, মাফলার।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারা থেকে সরে এসেছিলেন কল্লোলের লেখকরা। নিয়মভাঙ্গার খেলায় মেতে তাঁরা অনবদ্য কিছু ছোটগল্প দিয়ে গেছেন আমাদের। তাঁদের ওই পথে হেঁটেছেন পরবর্তীকালের অনেকেই। নতুন রীতির ছোটগল্প জন্ম নিয়েছিল বিমল করের হাতে। আর সেই স্রোতে যোগ দিয়েছিলেন পঞ্চাশের তরুণরা। ছোট গল্পের অন্তর্মুখী মেজাজ এবং বিশদ বুননই শুধু নয় মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা বিষয় হয়ে উঠল। আত্মজা গল্পটি যে-কোনও মানুষ কখনও না কখনও উপলব্ধি করেছেন যার কন্যাসন্তান রয়েছে। কিন্তু নতুন রীতি করতে গিয়ে বিমলদা কখনও হাংরি জেনারেশন বা শাস্ত্রবিরোধীদের মতো আন্দোলনের পতাকা তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না।

রোগা লম্বা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বিমলদাকে কখনও ময়লা পোশাক পরতে দেখিনি। কিন্তু নিজের ওপর প্রায়ই আস্থা হারিয়ে ফেলতেন। চিত্তরঞ্জন এভিন্যু একা পার হতে প্রায়ই দ্বিধায় পড়তেন। অথচ একই মানুষকে খুব ধীর গতিতে গাড়ি চালাতে দেখেছি। গাড়িতে ওঁর সঙ্গে বসে মনে হয়েছে কারও যেন কোনও অসুবিধে না হয় এভাবে উনি গাড়ি চালাতে চান। সেটা কিছুকালের জন্যে। বিমলদা যেহেতু অন্তর্মুখী মানুষ এবং পরিচিত পরিমন্ডলেই স্বচ্ছন্দ তাই কোনও বেপরোয়া ভাব ওঁর মধ্যে কখনই দেখা যায়নি।

এই বিমলদা যখন সিঁথির বাড়িতে থাকতেন তখন জানা গেল সল্ট লেকে বাড়ি করছেন। বাড়ি বানাবার কি ঝামেলা তা আমার ঠাকুর্দাকে দেখে জেনেছি। কিন্তু বিমলদার বন্ধুভাগ্য খুব ভাল। ফলে বাড়িটা হয়ে গেল। ঝকঝকে সুন্দর

বাড়িটা পরে বিশাল হল। এই ব্যাপারটা ওঁর স্বভাবের সঙ্গে ঠিক মেলে না। নতুন বাড়িতে একবার কয়েকজন তরুণ লেখক আর্জি জানালেন কিঞ্চিৎ ব্রান্ডি পান করাতে হবে। বিমলদা এক কথায় রাজি। পাঁচ ছয়জন জড় হলেন। গ্লাস ভর্তি জলে এক চামচ করে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে বিমলদা বললেন, 'সাবধানে খাস। দেখিস শরীর যেন খারাপ না হয়।' শুধু এখানে শেষ হয়নি, পরে খোঁজ নিয়েছেন কেউ মাতাল হল কিনা। হলে তো দায়টা তাঁরই। এই হলেন বিমলদা। ভদ্রতা শব্দটাকে ওঁর মতো আয়ত্ব করতে আমি আর একজনকে দেখেছি, তিনি শুধাংশু ঘোষ। চমৎকার লিখতেন। কিন্তু বাণিজ্যে সাফল্য পাননি।

বিমলদাকে কখনো গলা তুলে কথা বলতে শুনিনি। আবার দাঁতের যন্ত্রণা শুরু এবং শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ওঁর মনে হত ব্যথাটা থেকে গেছে।

বিমলদার প্রথম জীবন কেটেছিল হাজারিবাগ-আসানসোল অঞ্চলে। এই অঞ্চলের মানুষ তাঁর ছোটগল্পে, উপন্যাসে উঠে এসেছে বারংবার। একমাত্র দেওয়ালেই তিনি কলকাতাকে ধরতে পেরেছিলেন প্রথম জীবনে। সে সময় তিনি কলকাতায়। কিন্তু কখনই জীবন দেখতে বাইরে পা বাড়াননি। মূলত, ঘরকুনো স্বভাব বলে তাঁকে লিখে যেতে হয়েছে প্রথম জীবনে অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে এবং পরবর্তীকালে পরিণত বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে। অসামান্য প্রতিভা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। যে-মানুষ চট করে মিশতে পারেন না, হুট করে কোথাও যাওয়ার স্বভাব যাঁর নেই তাঁর পুঁজি ফুরিয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু আজও তাঁর লেখার জন্যে এই যে আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করি এখানেই তাঁর সাফল্য। সন্তোষকুমার ঘোষ আমায় একবার বলেছিলেন, 'বিমলবাবু গণেশের মতো। মায়ের চারপাশে ঘুরেই পৃথিবীটাকে দেখতে পান।'

এই বিমল কর যখন অসময়-এর জন্যে আকাদেমী পেলেন তখন সমস্যা হল। পুরস্কারটা আনতে দিল্লিতে যেতে হবে যেটা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সে সময় বিমলদার পুরস্কার পাওয়ায় আমরা খুব উদ্দীপ্ত। অনেক চেষ্টার পর কল্যাণ চক্রবর্তী আর আমি ওঁকে রাজি করালাম দিল্লি যেতে। আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে। কোনওমতে দিল্লি থেকে পালিয়ে আসতে পেরে তিনি যেন বেঁচে গেলেন।

পথে ট্রেনে একটি ঘটনা ঘটেছিল। হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। ওপরের বাঙ্কে শুয়েই আসছিলাম। বিমলদা একঘন্টা অন্তর আমার খবর নিয়ে চলেছেন। উল্টোদিকের বাঙ্কে একটি মধ্যবয়স্ক তামিল ভদ্রলোক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। ওঁর নীচের সিটে যে দুজন বসেছিলেন তাঁরা পিতা এবং কন্যা। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে লক্ষ করলাম কন্যা নীচ থেকে ওপরে উঠে ওই ভদ্রলোকের কম্বলের নীচে ঢুকে গেল। লোকটিকে কাকা সম্বোধন করতে দিনের বেলায় শুনেছি। তারপরেই আদিম কাজকর্ম আরম্ভ হয়ে গেল কম্বলের তলায়। ব্যাপারটা এমন অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল যে প্রতিবাদ না-করে পারিনি। আমাকে অসুস্থ অবস্থায় প্রতিবাদ করতে দেখে কল্যাণ দায়িত্ব নিয়েছিল। পরের দিন বিমলদা আমাকে বলেছিলেন, 'পর্দার আড়ালে কি হচ্ছে তা নিয়ে এত হইচই করলি কেন? তোরা বড্ড খুঁড়তে ভালবাসিস। এটা ঠিক নয়।'

বিমলদার কলম থেকে অশ্লীল শব্দ দূরের কথা যৌনতাকে উস্কে দেওয়া কোনও গল্প বের হয়নি। রতন ভট্টাচার্য একটি গল্প জমা দিয়েছিলেন দেশের জন্যে। সেখানে কাকিমার সঙ্গে ভাসুরের ছেলের শারীরিক প্রেমের বিবরণ ছিল। বিমলদা গল্পটা ফেরত দিয়েছিলেন। রতন ভট্টাচার্য কাকিমা কেটে বউদি করে আবার গল্পটি জমা দেন এই ভেবে যে, রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়কে বিমলদা কি করে উপেক্ষা করবেন। বিমলদা বলেছিলেন, 'আগে ওটা গল্প হবে তারপর অন্য কথা।' আদিরসে চোবানো কলমকে সহ্য করতে পারেননি তিনি।

এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই ছোট গল্পে বিমলদা যে শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছেছিলেন, উপন্যাসে সেটা সম্ভব হয় নি। তাঁর হাতে বাংলা ছোট গল্প যে-বিশেষ মাত্রা পেয়েছে এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। চুপচাপ বয়ে যাওয়া নদীর নিচে পাথরের ঠোকাঠুকির যে-শব্দ তা যেন শোনা যায় তাঁর গল্পে। দেশের গল্প সম্পাদক হিসাবে একের পর এক তরুণ শক্তিশালী লেখককে তিনি আবিষ্কার করে গেছেন দীর্ঘকাল ধরে। খুবই আক্ষেপের কথা, বিমলদা আর ছোটগল্প লিখবেন না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। মনে পড়ছে, বিমল মিত্রও ঘোষণা করেছিলেন শেষ উপন্যাস লিখে ফেলেছেন, কিন্তু

পরেও তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিমলদা যতদিন লিখবেন ততদিন বাংলা সাহিত্য লাভবান হবে।

সাতষট্টি সাল থেকে আনন্দবাজারের অফিসে আমার যাতায়াত শুরু হয়েছিল। তখন বাড়ির ভেতরটা ছিল অন্যরকম। অনেক ঘরোয়া। দেশে গল্প ছাপা হওয়ায় লেখার উৎসাহ বেড়েছে। কিন্তু প্রতি মাসে তো 'দেশ' গল্প ছাপবে না। অতএব আনন্দবাজারের রবিবারের পাতায় জায়গা পেতে হবে। তখন যিনি ওই পাতার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি এখনও রয়েছেন। কিন্তু সময় কী বিপুল পার্থক্য ঘটিয়ে দিয়েছে!

রমাপদ চৌধুরীর কোন লেখা আমি প্রথম পড়ি? তিতির কান্নার মাঠ না প্রথম প্রহর? আজ মনে নেই। কিন্তু চল্লিশ বছর আগে এই মফস্বলী কিশোর এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যার আবেশ এখনও ভুলতে পারিনি। লেখা পড়ে মনে হয়েছিল মানুষটি অত্যন্ত রোমান্টিক। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ একা বহন করেও মিষ্টি হাসতে জানেন। ওঁর পিয়াপসন্দ, কখনও আসেনি গল্পসঙ্কলনের গল্পগুলোয় সেই একই চাপা দুঃখ, কষ্ট, কষ্ট-সুখের কথা যা ওঁর সম্পর্কে আমার ভাবনাকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিল।

রবিবারের আনন্দবাজারের জন্যে গল্প নিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকতেই যাঁকে টেবিলের ওপাশে দেখতে পেয়েছিলাম তিনিই কি রমাপদ চৌধুরী! ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটি মানুষ পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি মুখে নিয়ে যেভাবে তাকিয়েছিলেন তা দেখে পা বাড়াবার সাহস হয়নি। 'কি চাই?' প্রশ্নটায় কোনও মমতা ছিল না।

'গল্প —!' গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

'ওখানে দিয়ে যান।'

ঘরের আর এক কোণে কাজ করছিলেন যে ভদ্রলোক তিনি কিন্তু হাসিমুখে বললেন, 'মনোনীত হলে ছাপা হবে।'

বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। এরকম কাঠখোট্টা মানুষ রমাপদ চৌধুরী? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি সেদিন। মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর

আনন্দবাজারের ভেতরের চেহারা পাল্টালো। করিডোর দিয়ে হাঁটলে কাচের ওপাশে বসে থাকা মানুষটিকে দেখা যায়। এক বিকেলে দেখলাম দুজন সুন্দরী মহিলা ওঁর সঙ্গে গল্প করছেন এবং ওঁকে বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হল। ইতিমধ্যে কয়েকমাস কেটে গেছে এবং আমার গল্পের ভবিষ্যৎ জানা হয়নি। সুন্দরী মহিলাদের সামনে উনি আর কতটা খারাপ ব্যবহার করতে পারবেন? ঢুকে পড়লাম দরজা ঠেলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, 'কি চাই?'

আমি একটা গল্প দিয়ে গিয়েছিলাম।'

সেদিন ওঁর সহকারী ঘরে ছিলেন না।

'ছাপা হলে জানতেই পারবেন। কি নাম?'

'সমরেশ মজুদার। দেশে আমার গল্প বেরিয়েছে।'

'দেশে ছাপা হলেই এখানে ছাপতে হবে নাকি? অদ্ভুত!' ওঁর গলায় এমন কিছু ছিল যে সুন্দরীরা সকৌতুকে আমার দিকে তাকালেন।

পরে বিমলদাকে ঘটনাটা বলেছিলাম। বিমলদা হেসে কথাটা উড়িয়ে দিতেন, 'দূর! তুই ভুল করছিস। রমাপদর বাইরেটা ওইরকম কিন্তু খুব আড্ডাবাজ লোক ও।'

এর কিছুদিন বাদে আনন্দবাজারে ঢুকে ওঁর ঘর এড়িয়ে যাচ্ছি এইসময় ওঁর সহকারী ডাকলেন। ওঁর নাম সুনীল বসু। কবি। এমন নির্ভেজাল ভালমানুষ খুব কম দেখেছি। বললেন, 'আপনাকে রমাপদবাবু খোঁজ করছেন।'

অতএব ভয়ে ভয়ে দরজা ঠেললাম। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত খিঁচানো প্রশ্ন, 'কি চাই?'

'আপনি আমাকে ডেকেছেন। আমার নাম সমরেশ মজুমদার।'

'ও। হ্যাঁ। ভাল হয়েছে, ছাপা হবে।' বলেই বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুই ধরে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। আমি যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি তা যেন মুহূর্তেই ভুলে গেলেন। একটিও কথা না বলে বেরিয়ে এসেছিলাম।

সে সময় এই অভিজ্ঞতা শুধু আমারই হয়নি। আমার সমসাময়িক লেখকবন্ধুরা বোধহয় একই কথা বলবেন। অথচ আমার চেয়ে যারা দশ বছর

আগে লিখতে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে জামিয়ে আড্ডা মারতে তাঁকে দেখেছি। আর হ্যাঁ, ছোটখাটো এই গম্ভীর মানুষটির কাছে সুন্দরী নারীদের ভিড় লেগেই থাকত। ওঁর স্বভাবমতো উনি কথা বলতেন কম, তারাই সম্ভবত বলে যেত। এঁদের বেশির ভাগ কবি হতে চেয়েছিলেন। রবিবারে কবিতা ছাপা হয় না, পুজোসংখ্যা বের হলে সূচিপত্রে আমরা এইসব কবিদের নাম আছে কিনা দেখতাম। না থাকলে মানুষটিকে খুব বেরসিক বলে মনে হত।

আমার সঙ্গে দূরত্বটা দূর হতে লেগেছিল বছর দশেক। কম সময় নয়। পুজোয় উপন্যাস লিখতে বললেন। বিকেলে ওর ঘরে গেলে দেখতাম মুখে সেই বিরক্তির ভাবটা একেবারে নেই। মুড়ি বাদাম আনিয়ে খাওয়াতেন। আর সেইসঙ্গে গল্প। এইসময় রাধানাথ ওঁর সহকারী হয়ে কাজ করছিল। দেখতাম নতুন কোন লেখক এলে উনি খুব সহজ গলায় কথা বলছেন। আমরা যেসব কথা ওঁকে বলতে ভয় পেতাম একসময়, এখনও সেই অভ্যেসে বলতে সঙ্কোচ হয়, নবীনরা এসে অনায়াসে তা বলছে এবং উনি তাতে একটুও অসন্তুষ্ট হচ্ছেন না। মনে আছে, একজন প্রতিবন্ধীকে সাহায্য করতে রবীন্দ্রসদনে টিকিট বিক্রি করে গল্পপাঠের আসর করেছিলাম। আশাপূর্ণা দেবী থেকে বিমল কর সেই আসরে যোগ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। রমাপদ চৌধুরী দুপাশে মাথা নেড়ে আপত্তি জানান। আমি চিনে জোঁকের মতো লেগে থাকায় শেষ পর্যন্ত রাজি হন এবং অনবদ্য গল্প পড়েন। এই ঘটনায় ওঁকে যাঁরা চেনেন তাঁরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা নাকি ওঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এই একজন লেখক কোথাও যান না, সভাপতি বা প্রধান অতিথি হওয়ার কথা ভাবতেও চান না।

বিমলদার সঙ্গে রমাপদদার দুটো জায়গায় মিল আছে। দুজনেই এসেছেন কলকাতার বাইরে থেকে। খড়্গপুরের রেল কলোনি থেকে ম্যাট্রিকে প্রথম বিভাগে পাশ করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসেছিলেন রমাপদদা। বোঝাই যাচ্ছে সে সময় কৃতী ছাত্রদের একজন ছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেছে নিলেন লেখালেখির জগৎটাকে। ওঁর হাত থেকে বেরিয়ে এল রাঢ়ী মহুয়ামিলনের পটভূমিকায় লেখা অনবদ্য ছোটগল্প। প্রথম প্রহর থেকে বনপলাশীর পদাবলী,

তাঁব লেখার ধারায় তিনি যে সবার থেকে আলাদা তা স্পষ্ট হয়েছিল। ভারতবর্ষ গল্পটি থেকে তাঁর লেখা অন্য বাঁক নেয়। এবং তারপর খারিজ। বিষয়ের বাহুল্য নেই, ঘটনার ঘনঘটা নেই, আমাদের প্রতিদিনের নানান সমস্যার একটিকে কেন্দ্র করে তিনি প্রতি বছর মাত্র একটি উপন্যাস লেখার অভ্যেস আয়ত্ত করলেন। এখনকার লেখকরা প্রচুর লেখেন, লিখে নিজেকে নষ্ট করেন, এই অভিযোগ অন্তত রমাপদদার বিরুদ্ধে করা যাবে না। ছোট গল্প লেখা তো ছেড়েই দিয়েছেন। যতক্ষণ মাথায় কোনও বিষয় ক্লিক না করছে ততক্ষণ কলম ধরেন না। আর ওই খারিজ থেকেই তাঁর নিজের ব্যবহার বদলে গেল। এতদিন লেখার বিষয় ছিল বাইরের জীবন, ব্যবহারে ছিলেন অন্তর্মুখী, গম্ভীর। একসময় আমার যা দেখে মনে হয়েছিল কথা বলতেও তাঁর বিরক্তি। খারিজের পর তাঁর প্রতিটি লেখা যখন অন্তর্মুখী তখন ব্যবহারে কোনও আড়ষ্টতা নেই। সহজ হয়ে মিশতে পারছেন অপরিচিতের সঙ্গেও। এই ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে পারবেন মনস্তাত্ত্বিকরা কিন্তু আমার মনে হয় তিনি লেখার ব্যাপারে অহেতুক কৃপণ হয়েছেন।

গত কুড়ি বছরে রমাপদদা সম্পাদক হিসাবে যথেষ্ট সাহসী হয়েছেন। কয়েক বছর ছোটগল্প লিখছে অথবা সদ্য লিখছে এমন কারও মধ্যে সম্ভাবনা দেখলেই তাকে দিয়ে পুজোসংখ্যায় উপন্যাস লিখিয়েছেন। রবিবারে ধারাবাহিক লেখার সুযোগ দিয়েছেন। তাদের বেশিরভাগই অবশ্য তাঁকে এবং পাঠককে হতাশ করেছে কিন্তু রামপদদা একটুও দমে যাননি। আজ সুচিত্রা যে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে তা তো ওঁর এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

বিমলদা এবং রমাপদদার দ্বিতীয় মিল হল দুজনেই নিজের সংসারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। নিয়মভাঙ্গার জীবন এঁদের কেউ বেছে নেননি। মদ্যপান, বেপরোয়া কোথাও চলে যাওয়া এঁদের স্বভাবে নেই। স্বামী এবং পিতা হিসেবে প্রচলিত শ্রদ্ধার জায়গা থেকে এঁরা কখনও সরে যেতে চাননি। নারী যদি এঁদের জীবনে কখনও ছায়া ফেলে তাহলে সেই ছায়ায় আবৃত হননি কখনও। ছেলেমেয়েদের সমস্যায় এঁরা বিচলিত হতে পারেন কিন্তু নিজের জীবনকে জটিল করার কোনও চেষ্টা করেননি। অথচ সর্বাংশেই এঁরা আধুনিক। যে যাঁর জীবন

দেখেছেন সাদা চোখে।

শক্তিদার খুব ভাল বন্ধু ছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রায়ই দেখতাম দেশ পত্রিকার অফিসে ওঁর সঙ্গে গল্প করতে আসতেন শক্তিদা। কিন্তু বন্ধুর স্বভাবের সঙ্গে তাঁর ছিল মেরুর পার্থক্য। ওঁদের দেখে আমার মনে হত শীর্ষেন্দুদা খুব উপভোগ করছেন শক্তিদার কথাবার্তা, সম্পর্কটা ছিল আন্তরিক। জলে ডুব দিয়েও চুল না ভেজানো বলব না, জলের পাশে বসে শীর্ষেন্দুদা আকাশের ছবি দেখার অভ্যেস আয়ত্ত করেছেন। বরং সমবয়সী বন্ধুদের থেকে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিমলদা বা রমাপদদার সঙ্গে তাঁর অনেক বেশি মিল রয়েছে। তিনি তাঁর সংসারকে ভালবাসেন। বোধহয় এই কারণেই শীর্ষেন্দুদার নামটা এবার আমার মনে এল।

আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মহেশ্বর দাসের হোস্টেলে থাকি। আমার রুমমেট ত্রিদিব মালাকার কবিতা লেখে, অমৃত পত্রিকায় ফিচার। আমি জানতাম ত্রিদিব আর ওর বন্ধু করুণাসিন্ধু দে শীর্ষেন্দুদার খুব ঘনিষ্ঠ। সে সময় আমরা শীর্ষেন্দুদার নাম জেনে গিয়েছি। দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ছোটগল্পে আলোড়ন এনেছেন। একদিন ত্রিদিবের সঙ্গে গেলাম শীর্ষেন্দুদার সঙ্গে দেখা করতে। সে সময় আমার মাথায় লেখালেখি করার কোনও ভাবনা ছিল না। হ্যারিসন রোডের একপাশে গলির মধ্যে একটি ঘরে তখন থাকতেন শীর্ষেন্দুদা। মেসের জীবন। খুব ভাল লেগে গেল ওঁকে। চল্লিশ পঞ্চাশ দশকে যেসব সিরিয়াস মানুষদের দেখা যেত যারা দারিদ্রের মধ্যে থেকেও কোনও অভাবকে পাত্তা দিতেন না তাঁদের একজন বলে মনে হয়েছিল। ধুতি এবং খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা একজন স্বচ্ছ যুবক মনেপ্রাণে সাহিত্য করতে চাইছেন, আর কোনও আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। জানলাম, বিমল করের অত্যন্ত স্নেহধন্য তিনি। লেখার ব্যাপারে একই রকমের খুঁতখুঁতে। ওই সময়ের লেখায় শীর্ষেন্দুদা যে বিমলদার লেখায় প্রভাবিত তা অনেকেই বলে থাকেন। সেই প্রভাবটা হচ্ছে মানুষের বাইরেটাকে না দেখে তার মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটু একটু করে বিশ্লেষণ করা। কফি হাউসের আড্ডায় ওঁকে দেখেছি

বেশিরভাগ সময় শুনে যেতে।

সে সময় বাংলা সাহিত্যে প্রচুর রথী মহারথী। পুজোসংখ্যার সূচিপত্রে তাঁরা এতটা জায়গা জুড়ে থাকতেন যে নতুন লেখকের পক্ষে সুযোগ পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবু সাগরময় ঘোষ ঠিক করলেন পর পর কয়েকজনকে তিনি সুযোগ করে দেবেন। সাগরদা পরে আমাকে বলেছিলেন, ওটা টেস্ট ম্যাচে চান্স পাওয়ার মতো ব্যাপার। তুমি সারাজীবন যত ভাল ছোটগল্প লেখ না কেন ওগুলো রঞ্জি ম্যাচের মতো। টেস্টে সেঞ্চুরি না করলে কেউ তোমাকে মনে রাখবে না। টেস্টে চান্স একবারই পাওয়া যায়। রান করতে না পারলে তুমি চিরদিনের জন্যে আউট।

কথাগুলো বলেছিলেন ঠাট্টা করেই কিন্তু ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছিল। এখন লেখকের বড় অভাব। তখন তো তা ছিল না। মনে আছে, প্রথম বছর লিখেছিলেন সুনিলদা, আত্মপ্রকাশ। প্রকাশমাত্রই সেটি আলোড়ন তুলেছিল, যাকে ক্রিকেটের পরিভাষায় বলা যায় সেঞ্চুরি। পরের বছর শীর্ষেন্দুদা লিখলেন ঘুণপোকা। দেখা গেল, সাধারণ পাঠক তেমন হইচই করছেন না কিন্তু সিরিয়াস পাঠক মুগ্ধ হলেন। ক্রিকেটের পরিভাষায় সেঞ্চুরি না হলেও পঞ্চাশ রানের একটি ইনিংস দেখে সমঝদাররা বললেন একজন জাত খেলোয়াড় এসেছেন। কোনও কোনও লেখক যা-ই লেখেন তাই পাঠকের ভাল লাগে। যেমন সুনীলদা। কারও কারও দুচারটে বই প্রচন্ড জনপ্রিয়তা পেল কিন্তু তারপর আর পাঠক রইল না। যেমন অবধূত, যাযাবর। আর জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এমন লেখক সস্তা লেখেন বলে যেসব সমালোচক নাক সিঁটকান তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, তেত্রিশ বছর সময়টা কতখানি কাল? তেত্রিশ বছর ধরে যিনি সমান জনপ্রিয় তাঁর পাঠকরা আপনার চাইতে নির্বোধ এমন ভাবার কোনও কারণ দেখছি না।

শীর্ষেন্দুদা ঘুণপোকায় জনপ্রিয়তা পাননি। কিন্তু ওই বই-এর বিক্রি বাড়ল অনেক পরে। যাও পাখি, পারাপার তাঁকে স্থায়িত্ব দিল। কিন্তু জনপ্রিয় করল দূরবীণ। পরে পার্থিব। তখন দেশ পত্রিকার বাংলাদেশে বিক্রি বন্ধ। ঢাকাতে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে বলতে আমাকে

অনুরোধ করেছিলেন, 'দেশে পার্থিব বেরুচ্ছে। কিছুটা পড়ার পর আর তো দেশ পাচ্ছি না। ওই লেখাটার জন্যে মুখিয়ে আছি। বইটা বের হলে পাঠাতে পারবেন?'

ঘূণপোকার পর শীর্ষেন্দুদা ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়লেন, রঙবেরঙের গেঞ্জি এবং প্যান্টে তাঁকে এত স্মার্ট দেখায় যে আমি ওকে প্রিন্স বলে ডাকতাম। এতে ওঁর প্রশ্রয় ছিল। কারণ আমরা একরকম দেশওয়ালি ভাই। শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ির মধ্যে দূরত্ব আর কতটা। শীর্ষেন্দুদা মানেই সৎ সাহিত্য, সিরিয়াস সাহিত্য, এরকম একটা নিয়ম চাউর হয়ে গেল। আর তার ফলে লেখার ব্যাপারে তিনি হয়ে গেলেন আরও খুঁতখুঁতে। লেখেন আর মনে হয় কিছুই হয়নি। ফলে লেখা কমতে লাগল। সম্পাদক যে দিন ধার্য করে দেন তা পেরিয়ে যেতে লাগল। সাগরময় ঘোষ বলেছিলেন, 'ওকে উপন্যাস লিখতে বললেই দুরকম অনুভূতি হবে। কাগজ বের হবার আগে উপন্যাসটা পাবো তো? আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়। পাওয়ার পর পড়ে অবশ্য মন ভরে যায়।' এই যে খুঁতখুঁতে স্বভাব, হয়তো বিমলদার সঙ্গ তার মধ্যে চলে এসেছিল।

কলেজে পড়ার সময় আমরা কমিউনিজমে বিশ্বাস করতাম। আমরা বললাম এই কারণে, তখন আমার বয়সী সবাই মানুষের কথা লিখতে চাইত এবং কমিউনিজম স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আকর্ষণ করত। কিন্তু কিছুদিন পরেই মনে হল সাহিত্য এবং কমিউনিজম কখনওই হাত ধরে চলতে পারে না। একজন কমিউনিস্ট মূলত মৌলবাদী। তিনি যে ধারণায় বিশ্বাস করেন তা থেকে কখনওই নড়বেন না এবং তার প্রচার করাটাই জীবনের লক্ষ্য হবে। সাহিত্য কখনওই প্রচার-সর্বস্ব হতে পারে না। যে সাহিত্য প্রচার করছে তার আয়ু লিফলেটের মতো ক্ষণস্থায়ী। আমাদের বাংলাভাষাতেও অনেক শক্তিমান লেখক এইরকম লেখা লিখতে গিয়ে শেষপর্যন্ত হারিয়ে গেছেন। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য যাঁরা ধর্মে বিশ্বাস করে সেই বিশ্বাস সাহিত্যে প্রচার করেন। এখানেও মৌলবাদ মাথা চাড়া দেয়। একজন লেখক বিশেষ রাজনীতি বা ধর্মাচরণে বিশ্বাস করতেই পারেন কিন্তু সাহিত্য করার সময় তাঁকে ওই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে নির্লিপ্ত

হতেই হবে। জীবনকে দেখতে হবে জীবনের মতোই। তার ওপর আহরিত ভাবনা চাপিয়ে দিলে ব্যাপারটা সাজানো বলে মনে হবে।

শীর্ষেন্দুদার মধ্যে হয়তো প্রস্তুতি চলছিল অনেকদিন থেকেই, সেটা আমার জানা নেই, কিন্তু তিনি অনুকূল ঠাকুরকে গুরুদেব হিসেবে গ্রহণ করলেন। শুধু গ্রহণ করাই নয়, ঠাকুরের বাণী তাঁকে পথ দেখাচ্ছে বলে বিশ্বাস করলেন। ধর্মাচরণের ওই পথ ধরে তিনি অনেকটা এগিয়ে গেছেন কিন্তু গৃহী থেকে গেছেন। আমার মনে আছে ওঁর বিয়ের সময় অনেকেই চিন্তায় পড়েছিল, ভাবী স্ত্রী সারাজীবন নিরামিষ খেয়ে থাকবেন কী করে। কিন্তু ওঁর সেই সমস্যা হয়নি কারণ শীর্ষেন্দুদার বিশ্বাস তাঁর পরিবারও গ্রহণ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল দীক্ষিত হওয়ার পর শীর্ষেন্দুদার জীবনযাপনের নিশ্চই আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। উনি শুধু দীক্ষা নেওয়ার জন্যে দীক্ষা নেননি, ঠাকুরের বাণীকে আদর্শ করে জীবনযাপন করতে চেয়েছেন। এর ফলে তাঁর আগের ভাবনাচিন্তায় পরিবর্তন আসতে বাধ্য। সেই পরিবর্তিত ভাবনা যদি প্রতিটি রচনায় স্পষ্ট হয় তা হলে সাহিত্য একপেশে হয়ে যেতে বাধ্য।

রাজনীতি এবং ধর্ম মানুষকে অন্ধ করে এটা আমরা জানি। বিশ্বাসে অন্ধ হয়ে যদি কেউ শান্তি পান তা হলে সেটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। কোনও এক ভক্ত সিগারেটের প্যাকেটে ট্রেনের টিকিট রেখেছিলেন। সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ভুল করে রাতের ছুটন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে প্যাকেটটা ফেলে দেন। এবং তখনই তাঁর খেয়াল হয় এবং বিনা টিকিটের যাত্রীর দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে গুরুদেবকে স্মরণ করেন। হঠাৎ ট্রেনটি গতি কমিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে অন্ধকারেই কিছুটা পেছনে ছুটে যেতেই সিগারেটের প্যাকেটটাকে পড়ে থাকতে দেখতে পান। তার ভেতর টিকিট ছিল। ট্রেনে ফিরে এসে তিনি আবার গুরুনাম করতে লাগলেন। আমৃত্যু তিনি কৃতজ্ঞ থেকে যাবেন।

এই ঘটনা সত্যি না মিথ্যে সেই তর্কে যাওয়া বোকামি। কথা হল, এই ঘটনা যদি কোনও লেখক বিশ্বাস করে গল্প-উপন্যাসে ব্যবহার করেন তা হলে

অধিকাংশ পাঠক মেনে নিতে পারবেন না। নায়ক বিশাল পুকুরের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন এক আলোকময় পুরুষ তাকে টেনে জলের ওপর পাঠিয়ে দিল, বারংবার এরকম কথা লিখে গেলে পাঠকের মনে পড়ে যেতেই পারে, 'কোথা হইতে কি হইল জানা গেল না কিন্তু মোহন বাঁচিয়া গেল।'

শীর্ষেন্দুদার লেখায় এইসব অলৌকিক কান্ড তেমন দেখা যায়নি। মাঝেমাঝেই নিয়ন্ত্রিত জীবনের ছাপ তাঁর লেখায় দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে একজন নিরাসক্ত মানুষ জীবনের কথা লিখছেন কিন্তু কখনই প্রচারে পঞ্চমুখ হননি। এই যে একটা জায়গায় আলাদা লাইন টানা, কতখানি ক্ষমতা থাকলে সেটা করা সম্ভব আমি জানি না। মনে আছে আমরা কয়েকজন গল্প পড়তে ডুয়ার্সে গিয়েছিলাম। চা-বাগানের বাংলোতে বিদেশি পানীয় ছিল অঢেল, শীর্ষেন্দুদা স্পর্শ করেননি। বলেছিলেন, 'আমি আনন্দ পাইনা।'

এই মানুষ যখন কলম ধরেন তখন ওই অনন্ত আনন্দের সন্ধান করে যান। বড় কঠিন এই কাজ। আর এ কারণেই তিনি তাঁর সমসাময়িক অন্য লেখকদের থেকে একদম আলাদা। বলতে দ্বিধা নেই বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই সাহিত্যের যে সিরিয়াস ভাবনাচিন্তা আরম্ভ হয়েছিল, সতীনাথ ভাদুড়ি, বিমল কর হয়ে আপাতত তার শেষ প্রতিনিধি-লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তবু ভয় হয়, সার্কাসের সেই তারের ওপর দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন, ভয় সেই কারণেই।

বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় লেখককুলের সঙ্গে শংকরের পার্থক্য অনেক ব্যাপারে না বলে সবক্ষেত্রে বলাই বোধহয় ঠিক কথা। বই বিক্রির রেকর্ড ধরলে বলতেই হবে, শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁর কোনও বই এত বিক্রি হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সাহিত্যের মূল ভাষা যেহেতু বাংলা তাই একমাত্র হুমায়ুন আহমেদই শংকরের সঠিক প্রতিদ্বন্দ্বী। হুমায়ুনের এক একটি বই প্রকাশিত হওয়ামাত্র পঁচিশ তিরিশ হাজার কপি অনায়াসে বিক্রি হয়ে যায়। এক লক্ষে পৌঁছাতে কয়েকমাস লাগে। কিন্তু যতদূর জানি বছর চারেক বাদে নতুন বই-এর জোয়ারে সেগুলো চাপা পড়ে যায়। শংকরের ক্ষেত্রে তা হয়নি। কত অজানারে

অথবা চৌরঙ্গী এখনও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বস্তুত, কোনও বই-এর এক লক্ষ কপি বিক্রি হবে, এবং একটি নয়, পরের পর, তা বাঙালি লেখক কখনও ভাবতে পারেনি, শংকর পেরেছিলেন। তাঁর পরে অবশ্য ওই সীমা কেউ কেউ পেরিয়েছেন।

বই-এর ব্যাপারে একজন লেখকের ভূমিকা কী? এতদিন যা দেখেছি তা হল, লেখক লিখবেন, প্রকাশক ছাপবেন, বিজ্ঞাপন দেবেন, বই বিক্রি হবে। অর্থাৎ লেখকের লেখা বই-এর ছাপা এবং বিক্রির ব্যাপারে প্রকাশকই যা কিছু করার করে এসেছেন। আমরা শুনেছি, এর ফলে অনেক লেখককে প্রকাশক বঞ্চিত করেছেন, লেখক প্রতারিত হয়েছেন। বেশি ছেপে কম বলা, বিক্রি হলেও হয়নি বলাটা একসময় কলেজ স্ট্রীটে নাকি স্বাভাবিক ছিল। আনন্দ পাবলিশার্সই প্রথম এ ব্যাপারে প্রফেশন্যালিজম আনল। প্রতিটি বইতে মূদ্রণ সংখ্যা ছেপে দেওয়া ছাড়া লেখককে বাৎসরিক বই বিক্রির হিসেব লিখিতভাবে জানিয়ে দিল। কিন্তু এর বাইরে বেশিরভাগ প্রকাশকই যতক্ষণ ভাল সম্পর্ক থাকছে এবং বই বিক্রি হচ্ছে ততক্ষণ লেখকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। অর্থাৎ কত বই ছাপা হচ্ছে, কী রকম বিক্রি হচ্ছে সে ব্যাপারে বেশির ভাগ লেখকই অন্ধকারে থাকেন। এ ব্যাপারের পরিবর্তন আমাদের আগের লেখকরা করতে পারেননি। তা ছাড়াও একটি হাস্যকর পদ্ধতি প্রকাশকরা বহু যুগ ধরে আঁকড়ে রয়েছেন। কোনওমতে একটা বই ছেপে দেশ বা অন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এঁরা বসে থাকেন এই ভেবে হাজার হাজার পাঠক ছুটে এসে তাঁর দোকান থেকে বই কিনে নিয়ে যাবে। একমাত্র বইমেলাতেই প্রকাশক পাঠককে পান, অন্য সময় তাঁদের কাছে পৌঁছাবার কোনও চেষ্টাই করেন না। কলেজ স্ট্রীটের বই ব্যবসা এখনও মান্ধাতার আমলে, আধুনিকীকরণের কোনও চেষ্টাই নেই। একা আনন্দ পাবলিশার্স তো গোটা কলেজ স্ট্রীট নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতেও শংকরের ভূমিকা নিশ্চয়ই ইতিহাস তৈরি করেছে। শংকরই হলেন প্রথম লেখক যিনি পণ্যদ্রব্যের ব্যবসার আধুনিক নিয়মগুলো তাঁর বই-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর বই কত কপি ছাপা হবে, কী ভাবে

ছাপা হবে, প্রচ্ছদ কেমন থাকবে, এবং দাম কী রাখা হবে থেকে শুরু করে বিক্রির পদ্ধতি নিজে নিয়ন্ত্রণ করেন। একসময় গ্রামের মুদির দোকানেও ধারাপাত, প্রথম পাঠ এবং শংকরের বই পাওয়া যেত। সম্ভবত এখনও যায়। স্টেশনে স্টেশনে ইংরেজি হিন্দি বই-এর পাশে শংকরের বই ঝুলছে। এককালে শিক্ষক এবং লেখককে বাঙালিরা শ্রদ্ধার নাম করে দরিদ্র দেখতে চাইত। একজন লেখক হবেন ভোলেভালা, ধুতিপাঞ্জাবি পরে সমাজসংস্কার করাই তাঁর কর্তব্য, এই ধরনের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হত। জানেন, বিভূতিভূষণ ঘাটশিলা থেকে এসে টাকা চাইলেন একজন প্রকাশকের কাছে, হাঁটুর নীচে ধুতি পরে এসেছিলেন হাতে কাপড়ের থলে, কত টাকা সেটা বললেন না। প্রকাশক শ'তিনেক টাকা জোগাড় করে রেখেছিলেন তাঁকে দেবেন বলে কিন্তু ফেরার সময় বিভূতিভূষণ মাত্র চল্লিশটি টাকা নিয়ে গেলেন। কি সরল মানুষ, আহা! হ্যাঁ, ওঁরা সরল, সাদাসিধে ছিলেন আর তাই অভাব তাঁদের ঘিরে থাকত। নজরুলকে মাত্র কয়েকটা টাকায় বিক্রি করে দিতে হল সঞ্চিতার কপিরাইট। শংকর এই ব্যবস্থাটাকে পাল্টাতে চাইলেন। যেহেতু প্রকাশনা একটি ব্যবসা আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ালে ব্যবসা লাটে উঠবে তাই যতটা সম্ভব আধুনিক তাকে হতেই হবে। অন্য প্রকাশক যখন একশো ষাট পাতার বই-এর দাম রাখছেন তিরিশ টাকা তখন শংকরের ওই আয়তনের বই বিক্রি হয়েছে পনেরো টাকায়। অর্ধেক দামে পাচ্ছেন বলে পাঠকদের অনেকেই প্রলুব্ধ হয়েছেন কিনতে। আবার বই-এর সঙ্গে ব্যাগের লোভেও অনেকে তাঁর পাঠক হয়েছে। বড় বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো যখন তাদের পণ্যের সঙ্গে আর একটা জিনিস ফাউ হিসেবে দিয়ে বাজার তৈরি করতে পারেন তখন বই কী দোষ করল? বই কি সেকালের হিন্দু বিধবা যে পুরুষের ছায়া পড়লে তার ব্যবসার জাত যাবে? বাংলা উপন্যাস ছাপা হত এগারোশো কপি, প্রথম সংস্করণ। শংকর ছাপতে বললেন দশ হাজার। এর ফলে খরচ হু হু করে কমে গেল, তাই দাম হয়ে গেল অর্ধেক। প্রকাশক জানতেন শংকরের বই দশ হাজার বিক্রি হবেই। তাই সমস্ত অনুশাসন তিনি মাথা নিচু করে মেনে নিয়েছেন।

এই অবস্থা রাতারাতি হয়নি। কত অজানারে দেশে বেরিয়েছিল গৌরকিশোর ঘোষের মাধ্যমে সাগরময় ঘোষের সঙ্গে শংকরের যোগাযোগ হওয়ার কারণে। লেখাটি আলোড়ন তুলেছিল। হাইকোর্টে বিদেশী ব্যারিস্টারের কাছে ক্লার্কের চাকরি করতে আসা হাওড়ার এক তরুণ যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা লেখার সময় মণিরত্ন হয়ে গেল। লক্ষ করা গেছে, ওঁর প্রায় বেশিরভাগ লেখায় একটি গরিব ছেলের স্বপ্ন দেখার ব্যাপার আছে। একটু শ্রীকান্ত শ্রীকান্ত প্যাটার্ন। ব্যক্তিগত জীবনে ক্লার্ক থেকে একটু একটু করে তাঁর যে উত্থান, সাহেব থেকে বড় সাহেবের ভূমিকা নিয়ে সর্বভারতীয় কোম্পানির অন্যতম দায়িত্ব নেওয়ার সময়েও তিনি ওই কাসুন্দের তরুণকে ছাড়েননি। বাঙালি যে স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে তা ওঁর আয়ত্তে বলে তিনি তাদের স্বপ্ন দেখিয়ে ছেড়েছেন।

জনপ্রিয়তার শিখরে যে লেখক দীর্ঘকাল রয়েছেন এ দেশের সমালোচকরা তাঁকে অবজ্ঞা করেছেন। কোনও সাহিত্য আলোচনায় তাঁরা শংকরের নাম উচ্চারণ করেন না। সেই কত অজানারের জন্যে পুরস্কৃত হয়েছিলেন, তারপর কোনও সাহিত্য পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়েছে বলে মনে পড়ে না। এ সব যাঁরা দিয়ে থাকেন তাদের চেহারা আমি দেখেছি। মনে আছে, আমাকে কিছু বছর আগে সাহিত্য আকাদেমির বিচারক করা হয়েছিল। প্রাথমিক নির্বাচনের পর ওঁরা কয়েকটি গল্প উপন্যাস প্রবন্ধের বই আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেগুলো পড়ে এবং আকাদেমির নিয়ম মেনে আমি যাঁকে নির্বাচন করলাম তাঁর কথা বলতে একটি গোপন সভায় যেতে হল। সভায় আমি ছাড়া আরও দুজন বিচারক এবং আকাদেমির পক্ষে একজন কোঅর্ডিনেটার। টেবিলের ওপর রাখা ওই বইগুলো একটি করে তুলে কোঅর্ডিনেটার প্রশ্ন করছেন আর আমরা মাথা নেড়ে যাচ্ছি। কখনও কখনও তিনিও মন্তব্য করছেন। একজন বিচারক তাই শুনে প্রশ্ন করছেন বইটি সম্পর্কে। বুঝুতে পারলাম তিনি হোমওয়ার্ক করে আসেননি। শেষপর্যন্ত প্রবীণ বিচারক রায় দিলেন, 'এই ছেলেটি শুনেছি ভাল লিখছে, ওকেই দেওয়া হোক।' আমার তীব্র আপত্তিতে সেবছর ছেলেটি আকাদেমি পায়নি, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ পেয়েছিলেন। আর শংকরের অপরাধ তিনি জনপ্রিয় তাই তাঁর নাম

তো উচ্চারিতই হবে না। কিন্তু কী এসে যায় তাতে? পাঠকের পুরস্কার তো তিনি পেয়েছেন সর্বতোভাবে।

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির মতো আরও একটি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আছে বলে আমার জানা নেই। জীবনের অভিজ্ঞতাকে শংকর কাজে লাগিয়েছেন। চাকরি জীবনে একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙেছেন আর সেই সিঁড়ির চারপাশের মানুষ তাঁর সাহিত্যে উঠে এসেছে। মনে রাখতে হবে সর্বভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থার ওপর তলায় তাঁর আগে কোনও বাঙালি লেখক চাকরি করেননি। এই দীর্ঘসময়ে বছরে একটি উপন্যাস এবং গল্প লিখেছেন সচেতনভাবে। যখনই প্রিয় বিষয় পেয়েছেন তখনই নিবন্ধ রচনা করেছেন। দুই বাংলার বাঙালিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ তো রেকর্ড বিক্রি হয়েছে। এই প্রথম আমরা দেখলাম একজন লেখক দুটো ভূমিকায় চমৎকার মানিয়ে নিয়েছেন। এক, লেখক হিসেবে পরের পর বিষয় নির্বাচন করেছেন সুপরিকল্পিতভাবে এবং লিখেছেন যথেষ্ট মমতা নিয়ে। দুই, তার বিলিব্যবস্থায় দেখিয়েছেন পেশাদারি দক্ষতা। রবীন্দ্রনাথের পর থেকে বাংলা বই-এর প্রচ্ছদ নিয়ে নানান পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু সুন্দরী নারীর ফটোগ্রাফ ব্যবহার করতে কেউ উদ্যোগ নেননি। দেখা গেল সেটা করায় শংকরের বই আরও আকর্ষণীয় হয়েছে।

এখন আমার কাছে কাল, মহাকাল শব্দগুলো খুব একটা মূল্যবান নয়। ছেলেবেলায় শুনেছিলাম যে লেখার কোনও ওজন নেই তা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। শংকরকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জীবিত অবস্থায় তাঁর বই-এর প্রচুর বিক্রি দেখে যেতে চান না মৃত্যুর পরে তা দীর্ঘকাল সমাদৃত হোক বলে আকাঙ্ক্ষা করেন? শংকর বলেছিলেন, 'বেঁচে থাকতে থাকতেই সন্দেশ যতটা সম্ভব খেয়ে নেওয়া ভাল।' রসিকতা করে বলা অবশ্যই, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল তাঁর সাহিত্যজীবন এবং গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি জনপ্রিয়তার শিখরে। পঁয়তাল্লিশ বছর সময়টাকে কী ভাবে মাপবো? কালের কত অংশ?

এ প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প বলি। পশ্চিমবাংলায় যে সব লেখক জনপ্রিয় তাঁদের বই প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশে রপ্তানি হত বছর দেড়েক আগেও। এইসময় ঢাকায় কিছু ধুরন্ধর বই-ব্যবসায়ী কলকাতায় প্রকাশকদের অনুমতি না নিয়ে ওই বইগুলো হুবহু ছেপে বিক্রি করতে লাগলেন। আগেও হত, কিন্তু সেটা হুবহু নয়। নতুনভাবে কম্পোজ করে, প্রকাশকের ছদ্ম ঠিকানা থাকত সেই বইতে। অতএব বইটি যে জাল তা স্পষ্ট বোঝা যেত। এখন আধুনিক মুদ্রণ প্রথায় আসলেরই কপি তৈরি করা যাচ্ছে। ফলে পশ্চিমবাংলা থেকে বই নিচ্ছেন না ওখানকার দোকানদাররা। তাঁরা অনেক সস্তায় পাইরেটদের কাছে একই বই পেয়ে যাচ্ছেন। দেখা গেল, কলকাতার চারজন লেখকের যে বই বের হচ্ছে তাই পাইরেটরা ছেপে ফেলছেন ওখানে। এইসব কান্ড দেখে এসে একজন প্রবীণ এবং উন্নাসিক সমালোচক একদিন বললেন, 'সব ধরা পড়ে গেল। এ দেশে যাঁরা সত্যিকারের জনপ্রিয় তাঁদের বই পাইরেটরা ছাপছে। ওদের তালিকায় শংকরের কোনও বই নেই। তার মানে ওঁর বই বিক্রির যে হিসেবটা দেখানো হচ্ছে তা বানানো। নইলে ওই পাইরেটরা ওঁকে ছেড়ে দিত?' ঢাকার একজন প্রকাশককে এ কথা বললাম। তিনি বললেন, 'শংকরের বই-এর দাম এত কম যে তা হুবহু ছাপলে পাইরেটদের লোকসান হয়ে যাবে। পাইরেসি করেও যদি লাভ না হয় তা হলে কোন মুর্খ হাত বাড়াবে?'

অতএব শংকর তাঁর মতন থেকে যাবেন তাঁর সাম্রাজ্যে।

তিন

'আজ থেকে একশ বছর আগে জন্মালে জমিদারের সুদর্শন পুত্র হয়ে গ্রামের পুকুরধার থেকে যুবতীদের তুলে নিয়ে যেতাম বাগান বাড়িতে। এখন যেহেতু সেটা সম্ভব নয়, তাই লিখি।'

একথা যিনি বলতে পারেন তিনি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার মানুষ নন। লেখালেখিকে তিনি তাঁর জীবনযাপনের অঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু

লেখালেখিসর্বস্ব জীবনযাপনের কোনও বাসনা তাঁর নেই। আমি লক্ষ করেছি কিছু মানুষ, এখনও একশ্রেণীর মানুষ, লেখালেখিকে অন্য চোখে দেখতে পছন্দ করেন। একজন লেখক হবেন সমাজসংস্কারক, তাঁর লেখার মাধ্যমে সমাজের চেহারাটাকে তিনি বদলাবেন। লোকশিক্ষা দেবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই লেখক কী রকম মানুষ হবেন? কোনও অহঙ্কার থাকবে না তাঁর, বুনো রামনাথমার্কা পোশাক পরলে ভাল হত কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন ধুতি-পাঞ্জাবি পরাই ভাল। রাম শ্যাম যদু যেই ডাকুক সুন্দরবন থেকে কোচবিহার ছুটে যাবেন সভায় প্রধান অতিথি হতে। একটা মালা আর কিছু সাজানো কথা শুনে ফিরে আসবেন স্লিপার ক্লাসে চেপে। সেই সভায় কলকাতার রিমেক শিল্পী পুরনো দিনের গান গেয়ে ওঁর পাশে বসে বিশ হাজার টাকা দক্ষিণা নেবেন, এসি-তে যাওয়া আসা করবেন এবং ওঁকে বলবেন, 'আমার মায়ের কাছে আপনার বই-এর কথা খুব শুনেছি।' অতএব লেখকের সময়ের দাম নেই, তাঁকে প্রকাশকরা টাকা দিল কি দিল না তাতে কিছু এসে যায় না, তিনি রামকৃষ্ণদেবের মতো জনশিক্ষা দিয়ে যাবেন।

লেখকদের সম্পর্কে এমন ধারণা এখনও যারা পোষণ করেন তাঁদের দেখলেই আমার শক্তিদার কথা মনে পড়ে, 'চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয় —!' একজন কৃষক আর এখন জাতির অন্নদাতা নন। তিনি চাষ করেন বেঁচে থাকার জন্যে, ছেলেমেয়েদের ভালভাবে বড় করার ব্যবস্থা করতে। একজন লেখক লেখেন তাঁর নিজের জন্যে। তিনি যে ব্যক্তিগত আনন্দ পান তা যদি অর্থ নিয়ে আসে তা হলে সেই অর্থে তাঁর পরিবার একটু ভালভাবে বেঁচে থাকবেই। লেখার বাইরে তিনি জিন্স পরে নাচানাচি করতে পারেন, মদ্যপান করতে পারেন, তাঁর মতো জীবনযাপন করতে পারেন। তিনি যদি প্রশ্ন তোলেন, আপনারা কোচবিহারে সভা করছেন আমি আমার কাজ ফেলে সময় নষ্ট করে সেই সভায় যাব কেন, তা হলে একটাই অজুহাত উদ্যোক্তারা খুঁজে পান, আপনি সাহিত্যিক, আপনার বই আমাদের ওখানে সবাই পড়েছে, তাই আপনাকে দেখতে চায়, আপনার মুখ থেকে কথা শুনতে চায়। লেখক যদি প্রশ্ন তোলেন, একজন

গায়কের সব ক্যাসেট বাড়িতে বাজিয়ে শুনেও তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিশ-ত্রিশ হাজার খরচ করেন কেন! তা হলে উদ্যোক্তাদের মুখের অবস্থা দেখে মনে হয় ওঁরা ভাবছেন বাঙালি ঘরের বিধবার মুখে এ কি অন্যায় কথাবার্তা। আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা ভালমানুষ ছিলেন। লেখক হিসেবে তাঁদের ক্ষমতা কতটা সে বিষয়ে ছিলেন উদাসীন। অনেকেই খুব খেতে ভালবাসতেন, কেউ আদর করে ডাকলে কৃতার্থবোধ করতেন। হয়তো ভাবলেন এত ডাকাডাকি করছে যখন তখন আমার পাঠকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। হয়তো এমনও হতে পারে, এক বছরে তারাশঙ্কর কতগুলো সভা করেছেন তার সঙ্গে নিজের করা সভার হিসেব মিলিয়েছেন বিমল মিত্র। পঞ্চাশের দশকে শিল্পীদের মধ্যে খেপ কথাটা চালু হয়েছিল। অনুষ্ঠান করে টাকা পাওয়াকে তাঁরা খেপ খাটা বলতেন। বিনা পয়সায়, কারও অনুরোধ না এড়াতে পেরে অনুষ্ঠান করতে যাওয়াটা তাঁদের কাছে ছিল আক্ষেপ। দু হাজার সাল পর্যন্ত অবস্থাটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

পুকুরধার থেকে সুন্দরী তুলে নিয়ে এসে বাগানবাড়িতে ঢোকা সম্ভব নয় বলে যিনি লেখেন বলেছেন তিনি নিজেকে নিয়েই রসিকতা করেছেন তা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। এমন রসিকতা যিনি করতে পারেন সেই মানুষটি কি রকম?

ছবিটা আমি এভাবে তৈরী করতে পারি। ছ'ফুট উচ্চতার একজন পুরুষ, যাঁর গায়ের রঙ বাঙালিদের তুলনায় বেশ ফরসা, মুখে সবসময় আলোআঁধারির হাসি, গমগমে গলায় চমৎকার টপ্পা বাজে, এবং সমস্ত শরীরজুড়ে একটি অভিমানের বেলুন কখনও ফুলে ওঠে কখনও খানিকটা চুপসে যায়। এই ছবির নীচে পরিচয় লেখার প্রয়োজন পড়ে না। যিনি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনিই জানেন, ইনি বুদ্ধদেব গুহ।

দক্ষিণ কলকাতার অতি সচ্ছল পরিবারের একজন যুবক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যখন হলুদ বসন্ত নামের উপন্যাস লিখে ফেললেন তখন অনেকেই নড়েচড়ে বসেছিল। এ রকম প্রেমের উপন্যাস কি আগে পাওয়া গিয়েছে? যে উপন্যাস

শুরু করলে শেষ না করে পারা যায় না, যে উপন্যাসের পাতায় পাতায় শুধুই প্রেম যার জন্যে আমরা একবুক মরুভূমি নিয়ে বসে থাকি? তার সঙ্গে মিশে গেছে প্রকৃতি। এই প্রকৃতি বিভূতিভূষণের নয়, নয় জীবনানন্দেরও। প্রেমের চোখে গাছগাছালির মধ্যে আর এক গাছগাছালিকে আবিষ্কার করেছেন লেখক। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নীলাঙ্গুরীয়, যাযাবরের দৃষ্টিপাত এবং বুদ্ধদেব গুহর হলুদ বসন্ত আলাদা আলাদা দেওয়ালের মতো কিন্তু সেই আলাদা দেওয়ালের মেঝে আর ছাদ এক। তার নাম প্রেম।

বুদ্ধদেবদা আমার চেয়ে অনেক ব্যাপারে অনেক এগিয়ে থাকলেও বয়সে বছর আটেকের বড়। আগে একটা নিয়ম চালু ছিল, যাঁরা লেখালেখি করেন তাঁদের শুরু হয় ছোটগল্প দিয়ে। উপন্যাসে হাত দেওয়ার আগে চমৎকার কিছু ছোটগল্প লিখে তাঁরা চমকে দিয়েছেন। নারায়ণবাবু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এই ইতিহাস। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় পরিচিত হয়েছিলেন শ্বেতপাথরের টেবিল গল্প লিখে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নীললোহিত নামে প্রচুর ফিচার লিখেছেন আনন্দবাজারে। ছোট গল্প নয় তবু ওঁর রবিবারের লেখাগুলোতে ছোট গল্পের মেজাজ থাকত। বুদ্ধদেব গুহ এমন কান্ড করেছেন বলে শুনিনি। ওঁর আগমন রাজার মতো। একেবারে উপন্যাস নিয়ে। রাজা শব্দটা ঠিকই লিখলাম, ওঁর বেঁচে থাকাটাও সর্বাংশে রাজকীয়।

রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বেশির ভাগ লেখকই এসেছেন নিম্ন অথবা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। তারাশঙ্কর লাভপুরের জমিদার পরিবারে জন্মেছিলেন কিন্তু প্রায় কৈশোর থেকেই তাঁকে অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। সামান্য কয়েকটি টাকা জোগাড় করতে না পেরে তিনি যে দুর্দশায় পড়েছিলেন তা তাঁর লেখা চিঠিতে জানা গেছে। বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসু অথবা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন শুরু হয়েছে দারিদ্রের থাবার সঙ্গে লড়াই করে। গোর্কি পড়ার পর আমার একটা ধরণা তৈরি হয়েছিল। অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই না করলে জীবন দেখা যায় না। আর জীবন যিনি না দেখলেন তাঁর পক্ষে

লেখক হওয়া সম্ভব নয়। শিল্পসাহিত্য তঁদের জন্যে নয় যাঁরা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছেন। অর্থাৎ একটু কষ্টের গন্ধ না মাখলে কাউকে লেখক বলতে আমাদের অনীহা ছিল। কল্লোলের লেখকরা যে বোহেমিয়ান জীবনযাপন করতেন তা আমাদের কাছে খুব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে ছিল। অচিন্ত্যকুমার পরে সরকারি উচ্চপদে ছিলেন, বুদ্ধদেব বসু অধ্যাপনা করেছেন, তারাশঙ্কর এম পি হয়েছেন, কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি তখন। উলটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শেষ বয়স পর্যন্ত যে লড়াই তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছি।

বুদ্ধদেব গুহর কৈশোর পর্যন্ত যে জীবন তা আর পাঁচটা ছেলের মতোই সাধারণ ছিল। ওঁর পিতৃদেব সরকারি চাকরি ছেড়ে যখন প্র্যাক্টিসে নামলেন তখনই ওঁদের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটল। বুদ্ধদেব বলতেই পারেন, 'আমি বাল্যকালে ঠাকুমার সঙ্গে মেঝেতে বিছানা পেতে শুতাম। রুপোর চামচ দেখতে পাইনি। বাবা যখন সাফল্য পেলেন তখন আমার ভাইয়েরা খুব ছোট। ওরা একটুও কষ্ট করেনি।'

হলুদ বসন্ত বেরিয়েছিল ষাটের দশকের শেষ দিকে দোলসংখ্যা আনন্দবাজারে। তার আগে জঙ্গলের গল্প লিখেছেন তিনি রবিবাসরীয়তে। জঙ্গলের গল্পকারকে সাহিত্যিক হিসেবে কখনও এ দেশের মানুষ গ্রহণ করেনি। জীবনের গল্পকার হলেন হলুদ বসন্তে।

ওঁর লেখার বিষয় এবং চরিত্র বাঙালি পাঠকের কাছে নতুন। কারণ আগে পরের মধ্য ও নিম্নবিত্ত লেখকেরা যাঁদের নিয়ে বেশি লেখালেখি করেছেন তাঁরা উচ্চবিত্ত মানুষ নন। যেহেতু বাঙালি পাঠকের বৃহদংশ মধ্য ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীতে বাস করেন তাই সেই সব লেখায় তাঁরা নিজেদের খুঁজে পেয়েছেন। না পেলেও বুঝতে বা অনুভব করতে অসুবিধে হয়নি। পদ্মানদীর মাঝিদের কলকাতার মধ্যবিত্ত দেখেনি। তবু তাঁদের নিয়ে লেখা উপন্যাসের জীবন গ্রহণ করতে কোনও অসুবিধে হয়নি। অর্থাৎ সংগ্রাম করা মানুষদের কথা পড়ে মনে মনে তাদের পাশে দাঁড়াতে বাঙালি পাঠক সবসময় এক পায়ে খাড়া ছিল।

বুদ্ধদেব যাঁদের নিয়ে লেখা শুরু করলেন তাঁরা আমাদের চারপাশে বাস করেন না। তাঁরা বিত্তবান মানুষ, তাদের বাড়ির মেয়ে বাসন মাজে না, ছেলেরা বাজারে যায় না থলি হাতে। বেকার হয়ে থাকার কারণে গঞ্জনা সহ্য করতে হয় না ছেলেদের। বুদ্ধদেব গুহর কথায়, 'যাদের নিয়ে আগে তেমন করে লেখা হয়নি, অথচ যাদের গল্প পড়ার জন্যে সাধারণ পাঠকের ঔৎসুক্য আছে তাদের কথা লিখতে চেষ্টা করলাম।'

বুদ্ধদেব গুহর লেখায় তাই বাঙালি পাঠকের ইচ্ছা পূর্ণ হল। আমরা যা নই যা হতে পারি না, তা পাওয়ার জন্যে সব সময় মুখিয়ে থাকি। এই বিত্তবান অথবা উচ্চবিত্ত পুরুষ এবং মহিলাদের জীবনযাপনের গল্প, আচরণ পাঠকদের সিংহভাগকে আপ্লুত করল। এর আগে রবীন্দ্রনাথ যে বিত্তবানদের নিয়ে লিখেছিলেন তাঁদের বিত্ত ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁদের গল্পের ঘরানা ছিল অন্যরকম। সেখানে বক্তব্যই ছিল আসল, চরিত্রগুলোর ব্যক্তিগত আচরণ রবীন্দ্রনাথের কাছে গুরুত্ব পায়নি। বুদ্ধদেব গুহ এই ব্যাপারটা তাঁর লেখায় আনলেন। এই কাজটা করার সময় একটা বিশাল ঝুঁকি ছিল।

বিত্তবানদের গল্প, তাঁদের অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের প্রেম এবং প্রেমহীনতার আখ্যান সাধারণ পাঠকের কাছে বাণিজ্যিক হিন্দি সিনেমা দেখার মজা এনে দেয়। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর লেখা সাহিত্যের মর্যাদা পায় না। এই ঝুঁকিটা নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব গুহ। ওই বারো-তেরো বছরের পর থেকে তাঁর জীবন ছিল অনেকটা এই রকম। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, সাহেবসুবো, রাজামহারাজাদের সঙ্গে ওঠাবসা, শিকার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে ওপরতলায় অবাধ যাতায়াত, সৎ আইনজ্ঞ হয়ে আয়কর দপ্তরের শেষ পর্যায়ে উপদেষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া — এসবই তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই মানুষ একসময় দক্ষিণীতে গান শিখেছেন, ভেতরে ভেতরে হয়তো অনুশীলন ছিল, কিন্তু তার প্রকাশ ঘটল অনেক পরে, পরিণত বয়েসে। বাড়িতে যিনি পুরোদস্তুর সাহেবি, উর্দিপরা বেয়ারা যেখানে মানানসই তাঁর একটা ব্যাপারে কোনও ছলনা নেই, যে জীবন তিনি জানেন না সেই জীবন নিয়ে লেখার চেষ্টা করেন না।

কিন্তু যে জীবন তিনি জানেন তাকে সাহিত্যে তুলে ধরেন অনায়াসে।

বুদ্ধদেব গুহ মানুষটি কিরকম?

বেশ কয়েক বছর আগে আমরা উত্তর বাংলায় গল্প পড়তে গিয়েছিলাম। প্লেনে যাওয়া হয়েছিল। দুপুরের প্লেন ছাড়তে দেরি করছিল। সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র ও অভিনেতা বিমল দেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বুদ্ধদেব দেরির জন্যে রাগারাগি আরম্ভ করলেন। আমরা জানতে পারলাম কবে কখন কোন প্লেন লেট করেছে তার বিবরণ। সে সময় প্লেনে চড়ি কালেভদ্রে। অতএব ওই গল্পে একটু অহঙ্কারের গন্ধ পাচ্ছিলাম। জলপাইগুড়ি শহরে উদ্যোক্তারা রেখেছিলেন তিস্তাভবনে। তখন তিস্তাভবনের ব্যবস্থা ভালই ছিল। আর কেউ কোনও কথা না বললেও বুদ্ধদেব গুহর মনে হয়েছিল ব্যবস্থাটা আদৌ ভাল নয়। তিনি যাঁদের নাম করতে লাগলেন তাঁরা উত্তরবাংলার বিখ্যাত মানুষ, চা বাগানের মালিক। এঁদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। তাঁদের জানালে এর চেয়ে অনেক ভাল জায়গায় থাকা যেত। আমাদের কিছু করার ছিল না। দু দিন ধরে গল্প পড়া চলল। শেষ দিন অনুষ্ঠানের পর আমরা চললাম মধু চা বাগানে। অনেকটা রাস্তা, অন্ধকার চারপাশে। তিনটে গাড়ি ছুটছিল। হঠাৎ পেছনের গাড়িটা আমাদের গাড়ির ড্রাইভারকে আলোর ইশারায় থামতে বলল। গাড়ি থামতে পেছনের গাড়ি থেকে বুদ্ধদেব গুহ হাঁক দিলেন, 'কি হে, স্কচের বোতলগুলো নিজেদের গাড়িতে রেখে অমাদের এখানে জলের বোতল রেখেছ? সেই জলই এক বোতল খেয়ে ফেললাম।' মধু চা বাগানে পৌঁছে জানা গেল সেদিন সমরেশ বসুর জন্মদিন। ভরপেট মদ্যপান করে সবাই গেলাম কুলি লাইনে নাচ দেখতে। হঠাৎ দেখি বুদ্ধদেব গুহ নাচিয়েদের সঙ্গে কোমর ধরে নাচছেন, গলায় মাদল ঝুলিয়ে। স্যুটের ওপর মাদল দেখতে একটুও ভাল লাগছিল না। কিন্তু ওঁর কোনও খেয়াল নেই। এ সময় গোলমাল আরম্ভ হল। দু দল হয়ে মদেশিয়ারা এমন ঝগড়া শুরু করল যে ম্যানেজার আমাদের নিয়ে বাংলোয় ফিরে যেতে চাইলেন। সবাই গাড়িতে ওঠার পর দেখা গেল বুদ্ধদেব গুহ নেই। ওঁকে ফেলে রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা

খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলাম। অন্ধকার কুলিলাইনে তখন উত্তেজিত শ্রমিকদের চিৎকার আমাদের মতো শহুরে লোককে বেশ ভীত করে তুলেছে। বুদ্ধদেব গুহকে পাওয়া গেল একটি ঝুপড়ির মধ্যে, খাটিয়ায় চিত হয়ে শুয়ে এক বৃদ্ধ মদেশিয়ার সঙ্গে গল্প করছেন। স্যুট পরে খাটিয়ায় কাউকে শুয়ে থাকতে এর আগে দেখিনি। না, আমি এখনও মনে করি না এটা শৌখিন মজদুরি। বরং উলটোটাই মনে হয়। একজন সহজ সরল মানুষকে কলকাতায় মুখোশ পরে থাকতে হয়। কিংবা এমন হতে পারে প্রথমটায় তিনি অভ্যস্ত দ্বিতীয়টি তাঁর বাসনায়।

বুদ্ধদেব গুহ জনপ্রিয় লেখক। কফিহাউসে একসময় বলাবলি হত, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের লেখক বুদ্ধদেব গুহ। একটু বয়স হলে তাঁর লেখা কেউ পড়ে না। তাঁর লেখা বানানো। সাজানো। সেটা আরও স্পষ্ট হয় তাঁর চরিত্রগুলোর নামকরণ করা দেখে। বেছে বেছে এমন নাম তিনি দেন যা বাঙালি আগে কখনও শোনেনি বা ছেলেমেয়ের নাম রাখেনি। অর্থাৎ তিনি সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। বুদ্ধদেব গুহ সম্পর্কে এই সমস্ত কথা এক কালে খুব চালু ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে ব্যাপারটা একদম উলটো হয়ে গেল। তিরিশ বছর ধরে একজন লেখক শুধু কিশোর-কিশোরীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে থাকতে পারেন না। ওঁর বই বিক্রির পরিমাণ অন্য কথা বলে। বাংলাদেশে ওঁর জনপ্রিয়তা আঁকাশছোয়া। কেন? মানুষ ওঁর লেখায় নিশ্চয়ই এমন কোন আনন্দ পান যা অন্য লেখকরা দিতে পারেননি।

আমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক একটু অদ্ভুত। এই আমাকে ভালবাসছেন, সুন্দর কথা বলছেন, আবার পরক্ষণেই মুখ গম্ভীর করে থাকছেন। ওঁর চিঠি লেখার নেশা আছে। জঙ্গুলে প্যাডে চমৎকার চিঠি লেখেন। একটু কান পাতলা মানুষ। কেউ হয়তো কিছু লাগালো অমনি অভিমানে টইটুম্বুর হয়ে গেলেন। জানতে পেরে ভুলটা ধরিয়ে দিতে চিঠি এল। ভালবাসার চিঠি। গোড়ার দিকে উপহার আসত। কেউ হয়তো বলেছে, সমরেশ মজুমদার আপনার নিন্দে করেছে। জানতে পেরে আমি ফোন করলাম, কে কি বলল সেটা যাচাই না করে বিশ্বাস করবেন?

পরের দিন অনেকগুলো নিউজিল্যান্ডের বিয়ার চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। খাওয়াতে ভালবাসেন খুব। কলকাতার অভিজাত ক্লাবগুলোয় তাঁর স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। ক্লাব কালচার নিয়ে ওঁর লেখা দুঁদে বাঙালি সাহেবদের প্রশংসা পেয়েছে।

এই অভিমানী মানুষটি কিন্তু অন্যকে নিয়ে মজা করতে এক পায়ে খাড়া। কিছুদিন আগে বন বিভাগের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব গুহ ডুয়ার্সে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। মারাত্মক কিছু হয়ে যেতে পারত, আমাদের সৌভাগ্য তা হয়নি। এই ঘটনা এবারের পুজো সংখ্যায় লিখেছেন তিনি। দুর্ঘটনা ঘটার পর তিনি যখন রাস্তায় প্রায় গাড়ি-চাপা হয়ে রয়েছেন, তখন তাঁর মনে হল, 'জনপ্রিয় লেখক সমরেশ মজুমদার যার বাড়ি জলপাইগুড়িতে, সেই বোধহয় ষড়যন্ত্র করে এই দূর্ঘটনা ঘটিয়েছে।' নির্দ্বিধায় লিখে দিলেন তিনি। আর টেলিফোনে আমাকে নাজেহাল হতে হয়েছে। যদি সত্যি কিছু না থাকে তা হলে বুদ্ধদেব গুহ লিখবেন কেন?

অথবা পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সামনে আমি এবং বুদ্ধদেব গুহ মঞ্চে প্রধান অতিথি এবং সভাপতি হয়ে বসে আছি। উনি তৃষ্ণার্ত হয়ে উদ্যোক্তাদের কাছে জল চাইলেন, 'বোতলের জল আনবেন ভাই কিন্তু সাদা বোতল। সমরেশ যে লাল বোতলের জল খায় সে জল নয়।' অমনি দর্শকরা হো হো করে হাসতে লাগল।

এটা কি হল জানতে চাইলে বললেন, 'দূর পাগল। রসিকতাও বোঝ না?'

মনে আছে একবার এক নির্জন রাস্তায় গাড়ির চাকা পালটাতে হওয়ায় আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। কোথাও কোনও মানুষ নেই, পিচের রাস্তাটা জঙ্গলের বুক চিরে চলে গিয়েছে। পাখি ডাকছে খুব। হঠাৎ গভীর একরকমের গলায় কথা বললেন, যে শব্দ মানুষের শরীরের ভেতর থেকে উঠে আসে, 'জানো, এ জীবনে সহবাস করিনি।' বলেই চুপ করে গেলেন। আমি প্রথমে অবাক হলাম পরে খুব কষ্ট হল। একজন সৃষ্টিশীল মানুষ মধ্যযৌবনে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেই পারেন কিন্তু আমি যে ওঁর গলায় আফসোসের সুর

শুনতে পেলাম। যেহেতু আমি বয়সে ছোট তাই ওঁর এই ব্যাপারে কিছু বলা বেয়াদপি হবে বলে চুপ করে থেকেছিলাম। কিন্তু তারপর থেকেই লাইনটা আমাকে অনবরত ঠোকর মেরে চলল। পরে রাতের আসরে কথাটা তুলেছিলাম। উনি আমার দিকে অবাক চোখে তাকালেন, 'দূর পাগল। আমি কি বলেছি আর তুমি কি ভাবলে! তা ছাড়া আমরা জীবনে যে সব কর্ম করি তার বেশির ভাগই তো অভ্যেসে করি। সহবাস করা কি সোজা কথা।'

না সোজা কথা নয়। আমি তন্ত্রশাস্ত্র কিছুটা পড়েছি। সহবাসের যে ব্যাখ্যা সেখানে দেওয়া হয়েছে তা তো রীতিমতো সাধনার উচ্চস্তরে না পৌঁছলে সম্ভব নয়। এইসব ক্ষেত্রে, বুদ্ধদেব গুহকে সাধক ভাবতে আমি রাজি নই। কিন্তু মানুষটি বুড়ো আঙুল মাটিতে রেখে দু'হাতে মেঘ ধরতে চেষ্টা করেন।

দেশে মাধুকরী বের হচ্ছিল। শুরুটা দারুণ। অনেক পরিণত। হঠাৎ উপন্যাসের কিছু শব্দ এবং বিবরণ সম্পর্কে পাঠকরা আপত্তি তুললেন। সম্পাদক বিব্রত হলেন। একি লিখছেন বুদ্ধদেব? তাঁর লেখায় কেন অশ্লীল গন্ধ থাকবে? বুদ্ধদেব স্বযুক্তিতে আক্রমণ নস্যাৎ করলেন। মাধুকরীর বিক্রিতে অনেকের চোখ টাটালো।

রবীন্দ্রনাথ গান গাইতেন, ছবি আঁকতেন। তারাশঙ্করও তাই। তবে তাঁর লেখা গান যতটা প্রচারিত, গায়ক হিসেবে তিনি ততটা নন। বুদ্ধদেবের গলায় গান ছিল। দক্ষিণী থেকে শুরু হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ঋতু গুহ রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে যে বিশেষ শ্রদ্ধার জায়গায় পৌঁছেছেন তা অনেক শিল্পীই পারেননি। একটা সময় ছিল যখন বুদ্ধদেব গুহকে লোকে ঋতু গুহর স্বামী বলে পরিচয় দিত। কিন্তু ক্রমশ লেখক বুদ্ধদেব খ্যাতির চূড়ায় উঠলেন। ওঠার পর তিনি গান নিয়ে ব্যস্ত হলেন। ক্যাসেট বের হল, অনুষ্ঠানে নাম ছাপা হতে শুরু করল। রবীন্দ্রনাথের গান নয়, বাংলার পুরাতনী গান তাঁর গলায় চমৎকার চেহারা পেল। তারপর ছবিতে হাত দিলেন। ছবি আঁকতেই এখন তাঁর বেশি ভাল লাগে। অর্থাৎ এক থেকে অন্য, অন্য থেকে আর এক, নিজেকে খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় যা বাঙালি মনে রাখবে তা

ওই বইগুলোর লেখক হিসেবেই। ইদানীং কেউ কেউ অভিযোগ করেন, তাঁর উপন্যাসেও চিঠির আধিক্য, কল্পিত চরিত্রের কাহিনী লিখতে গিয়ে ব্যক্তিগত চেনা মানুষের গল্প অকারণে আসছে। উনি কি লেখার ব্যাপারে অমনোযোগী হচ্ছেন?

আমি স্বীকার করি না এই অভিযোগের সত্যতা। দু-একটি রচনা মানে তাঁর সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা নয়। অভিমানে দেশ পত্রিকায় লেখা বন্ধ করেছিলেন। কয়েক বছর পরে দেশের মলাটে বিজ্ঞাপিত হল, বুদ্ধদেব গুহ ঘরে ফিরে এসেছেন। কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। চিরকাল অনেকের মধ্যে থেকেও একটি নিঃসঙ্গ মানুষ ঘর খুঁজতে চেয়েছেন। খুঁজে পেলেন কি না ভবিষ্যত তার জবাব দেবে।

সবে এম এ পরীক্ষা দিয়েছি। সে সময় আমার কাজ গোগ্রাসে সাহিত্য গেলা আর কফিহাউসে চুটিয়ে আড্ডা মারা। মহেশ্বর দাসের হোস্টেল থেকে চলে যাওয়ার নোটিস এসে গেছে। যেতে হলে জলপাইগুড়িতে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কথা সে সময় ভাবতেই পারতাম না। পিতৃদেব আর টাকা পাঠাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। একই সমস্যা ত্রিদিবের। ত্রিদিব আমার রুমমেট ছিল। কবিতা লিখত। এখন ভারতীয় দূরদর্শনের অন্যতম বড়কর্তা। আমরা দুজন অপেক্ষা করছিলাম তৃতীয় একজনের জন্যে যে এলে কফির অর্ডার দিলে আমরা একটু কফি খেতে পারব। আধঘন্টা কেটে যাওয়ার পর ত্রিদিব বলেছিল, 'দূর। চল, চা খেয়ে আসি।'

'কোথায়?'

'কাছেই। কাসিমবাজার রাজবাড়িতে।'

রাজবাড়িতে গেলে বিনা পয়সার চা পাওয়া যেতেই পারে কিন্তু সেখানে ঢোকার ছাড়পত্র ত্রিদিবের আছে তা আমি জানতাম না। মিনিট পনেরো হেঁটে আমরা সার্কুলার রোডের সেই বাড়িটিতে ঢোকার পর ত্রিদিব মূল প্রাসাদের দিকে না গিয়ে ডানদিকের কোয়ার্টার্সের দিকে এগোল। আমি একটু হতাশ হওয়ায় সে বলল, 'এখানে একজন লেখক থাকেন।'

সুদর্শন মধ্য তিরিশের যুবক লেখক দরজা খুললেন। একগাল হেসে বললেন,

‘আরে! কি খবর?’ ত্রিদিব স্পষ্ট বলল, ‘চা খেতে এলাম। এর নাম সমরেশ।’

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। আমাদের বসতে বললেন। ছোট ছোট দুটো ঘর। দেওয়ালে স্বামী-স্ত্রীর ছবি টাঙানো। উনি চা বানাতে গেলেন। ততক্ষণে আমি জেনে গেছি লেখকটির নাম অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি লিখতে এসেই পাঠক তৈরি করে ফেলেছেন। অতীনদা চা খাওয়ালেন। পূর্ববঙ্গের ভাষা ওঁর মুখে। এই সময় বউদি এলেন। তখন কোনও স্কুলে পড়াতেন তিনি। অতীনদা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, ‘এই হল তোমাদের বউদি। ওই যে দেওয়ালে ছবিটা দেখছ, ওটা ওঁর। কী ছিলেন আর আমি কী করেছি তা দেখতেই পাচ্ছ,’ বউদি লজ্জা পেয়েছিলেন। আমি জেনেছিলাম ওঁরা বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই করে চলেছেন।

আমাকে যদি স্বাধীনতার পর বাংলা সাহিত্যের প্রথম দশটি উপন্যাস বাছাই করতে দেওয়া হয় তা হলে নির্দ্বিধায় ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ তাতে জায়গা পাবে। এমন একটি অনবদ্য রচনা যা পথের পাঁচালীর পরে লেখা হয়েছে তার জন্যে যে কোনও সাহিত্য গর্বিত হতে পারে। কিন্তু উল্টোরথ পত্রিকার উপন্যাস প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়ে যে তিনজন লেখক বাংলা সাহিত্যে এসেছিলেন সেই মতি নন্দী, পূর্ণেন্দু পত্রীর পাশাপাশি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচিত হয়েছিলেন সমুদ্রের গল্প লিখে, জাহাজের খালাসিদের কাহিনী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে। স্পষ্টতই তাতে চমক ছিল। ওঁর আগে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একই বিষয় নিয়ে কিছুটা লিখেছিলেন।

গত তিরিশ বছরে অতীনদার সঙ্গে দেখা হয়েছে মাঝেমাঝে। প্রতিবারই মনে হয়েছে এই মানুষটির সঙ্গে আমার কিছু মিল আছে। ভদ্রলোক কোনও দলে নেই, মনে যা আসে তা গলা খুলে বলে দিতে পারেন। এবং ওঁর হাবভাব ব্যবহারে আছে মফস্বলি চেহারা, এখনকার কায়দাকানুন যে রপ্ত করতে পারেননি তাতে কোনও আক্ষেপ নেই। আনন্দবাজারে মাঝে মাঝে গল্প ছাপা হয়েছে কিন্তু যাকে বলে আনন্দবাজার পত্রিকার লেখক তা কখনও ছিলেন না। গত চল্লিশ বছরে আনন্দবাজারের বাইরের প্ল্যাটফর্ম থেকে লেখালেখি শুরু করে

খ্যাতিমান হওয়া মুষ্টিমেয় লেখকদের মধ্যে অতীনদা অন্যতম। চটজলদি মনে পড়ছে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কঠিন কর্মটি করতে পেরেছিলেন। কঠিন কর্ম বললাম এই কারণে, আনন্দবাজার-দেশ ইত্যাদি পত্রিকাগুলোর প্রচার এবং বিক্রি একজন লেখককে সহজেই বৃহৎ সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। প্রফুল্ল রায় লেখকজীবন শুরু করেছিলেন দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস পূর্বপার্বতী লিখে। কিন্তু সেই সুযোগ অতীনদা পাননি। পরিণত হয়সে তিনি এই বাড়ির কাগজগুলোয় লিখেছেন কিন্তু ততদিনে তাঁর প্রধান লেখাগুলো লেখা হয়ে গিয়েছে।

অতীনদার পিতৃদেব এবং তাঁর ভাইয়েরা পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় এ দেশে এসে বহরমপুর শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে প্রায় জঙ্গুলে জায়গায় জমি কিনেছিলেন জলের দরে। সেখানে মাটির ঘরে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে প্রতিটি দিন কাটানোই কষ্টকর ছিল। আশেপাশে মানুষের তেমন বসতি নেই, ছিন্নমূল একটি বড় পরিবার জানে না আগামীকাল কি হবে, অতীনদার বাল্যকাল কেটেছিল ওই পরিবেশে। অতীনদার ভাষায়, 'সেইসময় পরপর দুদিন একেবারে অভুক্ত থাকতে হয়েছে আমাদের।'

ছাত্র হিসেবে ভাল থাকায় বহরমপুর স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু স্কুল শেষ করার পর আর কিছু করার ক্ষমতা নেই। তখন রোজগার করা দরকার। একটি রাজনৈতিক দলের পত্রিকা বের হত। সেখানে তাঁর কাজ জুটল। প্রেসে কাগজ পৌঁছে দেওয়া, সেখান থেকে নিয়ে আসা। প্রুফ দেখা আবার ফাইফরমাস খাটা। অথচ মাইনে পাওয়া যেত না নিয়মিত। সেটাও পাঁচ-ছ টাকার বেশি নয়। অভাবের ছোবল খেতে খেতে ছাপা কাগজ ঠিক জায়গায় না পাঠিয়ে সের দরে বিক্রি করে দিয়ে চাল ডাল আলু কিনে গ্রামে ফিরলে দেখতে পেতেন অভুক্ত মুখগুলোয় স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠেছে।

গ্রামের কিছু পরিচিত তাঁতি কলকাতায় তাঁত বুনতেন। তাঁদের সূত্র ধরে কলকাতায় এসে ঠিক করলেন কলেজে পড়বেন তাঁত বোনার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কাজটা সহজ নয় বুঝতে পারার পর তাঁতিরা প্রস্তাব দিল বামুনের ছেলে যদি তাঁদের

দুবেলা রেঁধে দেন তা হলে তাঁত বোনার জন্যে যে টাকা তিনি পাবেন ভেবেছিলেন তার অর্ধেক তাঁরা চাঁদা তুলে দিয়ে দেবেন। শুরু হল রান্নার কাজ।

এই অবধি জানার পর আমরা আশা করতে পারি একেবারে তৃণমূল থেকে একটি লেখক তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে হাজির হচ্ছেন। যাঁরা রাজনীতি করেন, তাত্ত্বিকদের বই যাঁদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে তাঁরা ফর্মুলার বাইরে কিছু ভাবতে পারেন না। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নিপীড়িত, অসহায় মানুষের যন্ত্রণার কথা বলার জন্যে পরবর্তী কালে সাহিত্য শুরু করেননি। তাঁর রোমান্টিক মানসিকতা জীবনকে অন্যভাবে দেখেছিল। ওই অল্প বয়সের অভাবের দিনে প্রথম বৃষ্টি নামলে মাটি থেকে যে সোঁদা গন্ধ বের হত তা তাঁকে অস্থির করত। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অপু হয়ে যেতেন। পথের পাঁচালী অভাবী দুঃখী অসহায় মানুষের কাহিনী নয়, মানুষের স্বপ্ন দেখার দলিল।

ওঁর জাহাজে চাকরি পাওয়ার কাহিনীটিও অদ্ভুত। অভাবের তাড়নায় রোজ অনেকটা হেঁটে উপস্থিত হতেন যেখানে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। শরীরের মান যথাযথ না হওয়ায় তাঁকে বাতিল করে দেওয়া হলেও লুকিয়ে ঢুকে পড়েন বাছাইদের দলে। তখনও বাছাই করা প্রার্থীদের নাম কাগজে লেখা হয়নি। ফলে চাকরি হল। সেই ট্রেনিং অমানুষিক, পরিশ্রমে শরীর অসাড় কিন্তু অতীনদা স্বপ্ন দেখতেন ওই ট্রেনিং-এর পরে মাইনে পাওয়া যাবে। সেই মাইনের টাকা বহরমপুরের গ্রামে পাঠালে সেখানে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি থেকে গন্ধ বের হবে।

ওই সূত্রে জাহাজে চাকরির ছাড়পত্র মিলল। কিন্তু জাহাজ নেই। শেষ পর্যন্ত সিলেটের এক প্রৌঢ় সারেঙের বদান্যতায় মালবাহী জাহাজে কাজ পাওয়া গেল। বারো ঘন্টা ধরে ডেক পরিষ্কার করতে হবে এবং বয়লারে কয়লা ফেলতে হবে। একটি লিকলিকে অভাবী বাঙালি শরীরের পক্ষে সেটা প্রায় অসম্ভব হলেও অতীনদা পারলেন। সমুদ্রে ভেসে ভেসে এ বন্দর থেকে সে বন্দরে নোঙর করা জাহাজের খালাসি হয়ে জীবন দেখলেন নতুন করে। বন্দরে বন্দরে জাহাজিদের একটি করে বউ থাকে - এ প্রবাদ তাঁর ক্ষেত্রে খাটল না। তিনি দেখতেন জাহাজিরা বন্দরে নেমেই চেনা জায়গায় ছুটে যেত যেমন তেমনই অনেকে

জাহাজ থেকে নামতেই চাইত না। অতীনদা অচেনা শহরে হেঁটে বেড়াতেন দেশ দেখবেন বলে।

এইভাবে একদিন আর্জেন্টিনায় পৌঁছেছিল জাহাজ। একা একা হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা হারিয়েছিলেন তিনি। যাকে জিজ্ঞাসা করছেন সেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কারণ কেউ ইংরেজি বোঝে না। অথচ বিকেল শেষ হয়ে আসছে। অসহায় অবস্থায় একটি বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন একজন প্রৌঢ়া এগিয়ে এসে কিছু প্রশ্ন করলেন যা তাঁর বোধগম্য হল না। শেষ পর্যন্ত ভাঙা ইংরেজি শুনে লাফিয়ে উঠলেন অতীনদা। ওই বাড়িটি প্রৌঢ়ার। তিনি ওঁকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। নিজের হাতে চা বানিয়ে কেক প্লেটে সাজিয়ে দিলেন। আনন্দে অতীনদার ইচ্ছে করছিল প্রৌঢ়াকে প্রণাম করতে। একটু পরে প্রৌঢ়ার মেয়ে বাড়িতে ফিরল। এক ঢাল কালো চুল, কালো চোখ, মাজা রঙের অপূর্ব সুন্দরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন বহরমপুরের এক রোম্যান্টিক তরুণ। মেয়েটিও।

'তখন বুঝলা, সাহেবের মতো দেখতে ছিলাম। টকটকে ফরসা, জাহাজে কাম করায় শরীর মজবুত আর আধা ইংরিজেতে কথা বলায় ভাষাটা খুব সহজ — !'

'তখন সাহিত্যের ভাবনা ছিল না?'

'দুর। সাহিত্য! তখন আমার দুনিয়ায় একটি মুখ, ওই মেয়েটি তখন স্বপ্নের মতো সত্যি।'

যে কদিন জাহাজ বন্দরে ছিল সে-কদিন শুধু পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া, কফির দোকানে বসে মুখোমুখি কথা না বলে সময় কাটানো। অতীনদা ঠিক করলেন দেশে ফিরে মা-বাবাকে এই মেয়ের কথা জানাবেন। বাকি জীবন এই মেয়ের সঙ্গে কাটানোর জন্যে ইগলুতে থাকতেও তখন তিনি রাজি। যেদিন জাহাজ ছাড়বে সেদিন মনের দুঃখ চাপা দিতে বয়লারে কয়লা ফেলছিলেন অতীনদা। সমস্ত শরীর কালো হয়ে গিয়েছিল। এই সময় কেউ একজন জানাল তার গেস্ট এসেছে দেখা করতে। ওই ভূতের মতো চেহারা নিয়ে বাইরে এসে দেখেছিলেন পরীর মতো সেজে মেয়েটি এসেছে হাতে ফুল নিয়ে। তাঁকে দেখে

হেসে গড়িয়ে পড়েছিল সে।

আর্জেন্টিনা কোথায়, আর বহরমপুর কোথায়! দু'বছর পর ছুটি পাওয়া গেল। সঙ্গে মাইনের জমানো টাকা। কলকাতা থেকে বাসে বহরমপুর। আকাশ ভরতি কালো মেঘ। বহরমপুর থেকে গ্রামের দিকে যখন হাঁটতে শুরু করলেন তখন টুপটাপ বৃষ্টি। আচমকা ঝড় উঠল। আর হঠাৎ চারপাশের চরাচরে মাটির সোঁদা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল হু হু করে। এই গন্ধ শরীরের সমস্ত রন্ধ্র দিয়ে উপভোগ করতে করতে অতীনদা আবিষ্কার করলেন এর চেয়ে আরাম আর কিছুতেই পাবেন না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গ্রামে পৌঁছেছিলেন। তাঁর ফিরে আসা, অতগুলো টাকা পাওয়া, বাড়িতে উৎসব বসেছিল। দু'বছর পরে অতীনদা আবিষ্কার করলেন মা বাবা ভাই বোন কাকা জ্যেঠা ইত্যাদি মানুষের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক তার টান বড় জোরালো। আর যে মাটিতে জন্মেছি, যে ঘাসে পা ফেলেছি তার গন্ধ পেলে হৃদয়ের শিকড়ে যে নাড়া লাগে তার কোনও বিকল্প নেই। এসব ছেড়ে পৃথিবীর কোনও হিরের বিছানায় শুলেও তাঁর ঘুম আসবে না। গোটা তিনেক চিঠি এসেছিল আর্জেন্টিনা থেকে, আবদার, অনুনয়, অভিমানের কান্না ঢেলে জাহাজের ঠিকানায়। অতীনদা লিখেছিলেন, 'জায়গা বদল করলে আমি বা তুমি কেউ ভাল থাকব না। অতএব যত নির্মম হোক, সত্যিকে মেনে নিতে হবে।'

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক বন্ধুদের অনেকেই বোহেমিয়ান জীবনযাপন করেছেন, নিয়ম ভেঙেছেন। তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সীমানার মধ্যেই ছিলেন। থাকতে পছন্দ করেছেন। মদ্যপানে তাঁর আপত্তি নেই কিন্তু সেটা করেন মাঝেমধ্যে, দলে পড়ে, আর সেটাও অল্পস্বল্প। স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূদের নিয়ে তাঁর যে সংসার সেখানে তিনি কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, বাবা। বাড়ির ওপর ওঁর প্রচন্ড টান। সাফল্য তাঁকে যে স্বস্তি দিয়েছে তিনি উপভোগ করছেন, নিজের বাড়ি তৈরী করেছেন। কিছুদিন আগে সেই বাড়িতে ডেকেছিলেন আমাদের কয়েকজনকে। সম্পূর্ণ একটি পারিবারিক আবহাওয়ায় আমরা আড্ডা মারলাম। ওঁর স্ত্রী আমাদের পানভোজনের আয়োজন করেছিলেন। কোথাও একটু বিরক্ত

হতে দেখিনি মেয়েদের। বাড়ির কর্তা যে কোনও অন্যায় করতে পারেন না এই বিশ্বাস ওঁদের আচরণে স্পষ্ট। সংসারে এই যে পরস্পরের প্রতি আস্থা রাখা, অতীনদা তাই চেয়েছেন চিরজীবন। আবার এখানেই তাঁর সঙ্গে বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিছুটা মিল থাকা সত্ত্বেও বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সংসারে থেকেও অতীনদা বাউন্ডুলেদের ডাক পেয়ে কিছুটা সময় বেরিয়ে আসতে পারেন।

খুব বড় সাহিত্য পুরস্কার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পাননি। অনেকেই পায় না। এদেশে এইসব পুরস্কার দেওয়ার নিয়মগুলো নিয়ে বিতর্ক ওঠে। কিন্তু পাঠকদের ভালবাসা পেয়ে গেছেন যে লেখক তাঁর কাছে সাজানো পুরস্কারের কোনও মূল্য থাকা উচিত নয়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাবৎ লেখালেখিতে একটা স্বপ্ন দেখার চেষ্টা আছে। সেই স্বপ্ন খুব ঘরোয়া। বাইরের ঘটনার ঘনঘটা পার হয়ে এলে মাটির সোঁদা গন্ধ খোঁজার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে লেখক তাঁকে কোনও ফর্মুলায় ফেলা যায় না।

আমার আগের প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান গদ্যলেখক হিসেবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে স্বীকার করতে কোনও অসুবিধে হত না। শব্দ ওঁর কলমে নিত্যনতুন চেহারা নিত। শ্লেষের ব্যবহার ছিল একেবারে নিজস্ব ঘরানায়। আর ওঁর লেখার বিষয়বস্তু ছিল গ্রাম এবং মফস্বলের সেই সব মানুষেরা যাঁদের আমরা আবছা চিনি কিন্তু একটুও জানি না। কোনও গঞ্জের পাইকার, বিলে নৌকো নিয়ে সারারাত ছিপ ফেলে থাকা কোনও মাছমারা, চোলাইয়ের হাঁড়ি মাথায় নিয়ে শরীর নাচিয়ে হেঁটে যাওয়া যুবতীর ছবি তুলে শব্দ দিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা যে লেখকের তাঁকে অস্বীকার করার কোনও উপায় ছিল না।

দেশ পত্রিকায় কুবেরের বিষয় আশয় দিয়ে ওঁর যাত্রা শুরু। উপন্যাসের বিষয় এবং তার বলার ভঙ্গি বলে দিত একজন লেখক এসে গেছেন মাটির গল্প বলতে। অনবদ্য যেসব ছোটগল্প সেসময় তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল তাতে পত্রিকাগুলোই সমৃদ্ধ হতে লাগল। এরকম যার শুরু তাঁর তো

উচিত এভারেস্টের চূড়োয় উঠে ফ্ল্যাগ পুঁতে আসা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখে আমার মনে হয়েছিল এই চেহারা শ'খানেক বছর আগের স্বচ্ছল বাঙালির সঙ্গে চমৎকার মিলে যায়। কালীঘাটের পটে যেন তাঁকে মডেল করে সেকালের বাবুদের ছবি আঁকা হয়েছিল। তাঁর কথাবার্তায় সেই সময়ের গন্ধ পুরোপুরি পাওয়া যায়।

একটু একরোখা জীবন, নিজের সঙ্গে রসিকতা করতে অন্যকেও আক্রমণ করা, খুব বড় একটা স্বপ্ন দেখে সবাইকে একজোট করে তাতে বিফল হয়ে ঘনিষ্ঠদের অপছন্দের কারণ হওয়া এবং নিজের আচরণে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার পেছনে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনও পরিকল্পনা ছিল বলে আমি মনে করি না। কিন্তু ওটা হয়ে গেছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্ভট ঘটনাগুলো তো এখন প্রায় প্রবাদ হয়ে গেছে। ওগুলো সংগ্রহ করে সম্পাদনা করলে একটি চমৎকার উপন্যাস হয়ে যায়। কিন্তু যে অর্থে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিয়ম ভাঙার স্বচ্ছন্দ প্রয়াস ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে সেই একইভাবে গ্রহণ করতে রাজি নন অনেকেই।

শ্যামলদাকে নিয়ে এক কবি তাঁর সম্পাদিত ছোটগল্পের কাগজে গল্প লিখেছিলেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, একজন লেখক এবং তাঁর আচরণ ছিল গল্পের বিষয়বস্তু। কাগজটি ছাপা হওয়ার পর দক্ষিণ কলকাতার একটি রেস্টুরেন্টের প্রভাতী আড্ডায় গিয়ে সম্পাদক-লেখক দেখলেন সেখানে শ্যামলদা বসে আছেন। একটু অস্বস্তি নিয়ে তিনি অন্য দিকে সরে যাচ্ছিলেন কিন্তু শ্যামলদা তাঁকে মধুর স্বরে ডাকলেন, 'কিরে, ওদিকে কেন? এখানে আয়। আমি তো মোটা হয়ে গেছি, দৌড়োদৌড়ি করতে পারব না, তুই কাছে এলে তোর গলা টিপে মেরে ফেলব! আয় কাছে আয়।' শ্যামলদা এটা করতে পারেন বলে সেই সম্পাদক-লেখক বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন।

একজন সমবয়সী লেখক একদা কিছু গল্প শুনিয়েছিলেন। শ্যামলদা তাঁকে সিনেমা দেখাবেন বলে সঙ্গে নিয়ে বাসে উঠলেন। কন্ডাক্টার টিকিট চাইতে এলে বন্ধুকে দেখিয়ে গম্ভীর মুখে বলতেন, আমার ভাই। কন্ডাক্টার অন্যদের

টিকিট কাটতে লাগল। শ্যামলদা তখন বেকার। পুলিশ বা স্টেটবাসে চাকরি করেন না। বাস থেকে নেমে সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। ছবি শুরু হতে চলেছে। বন্ধু তাগাদা দিলেন টিকিট কাটতে। বললেন 'দাঁড়া না।' তারপর এক সময় এগিয়ে গেলেন অপেক্ষায় থাকা এক বৃদ্ধার সামনে, 'মাসিমা, কি হয়েছে?'

'আরে বলো না বাবা, ওঁর কথা ছিল অফিস থেকে চলে আসার, কোনওদিন সময় রাখতে পারে না, আমি যে চলে যাব তারও উপায় নেই, উনি এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন। একবার ছবি শুরু হয়ে গেলে আমি কিছুতেই দেখব না।' ভদ্রমহিলা বললেন।

'আপনার কোনও চিন্তা নেই। আপনি চলে যান, আমি ওঁকে বলে দেব।'

'তুমি ওঁকে চেনো?'

'কি বলছেন ! বিলক্ষণ চিনি।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তাহলে, এই টিকিট দুটো।'

'আমি ও দুটো বিক্রি করে মেসোমশাইকে দিয়ে দেব।'

ভদ্রমহিলা যেন বেঁচে গেলেন এমন মুখ করে টিকিট দুটো শ্যামলদাকে ধরিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া মাত্র শ্যামলদা বন্ধুকে ডাকলেন, 'আয় রে, ছবি দেখবি চল।'

এসব গল্পে একটা নির্দোষ রসিককে খুঁজে পাওয়া যায়। সমবয়সী লেখককে নিয়ে গিয়েছিলেন তারাশঙ্করের বাড়িতে পরিচয় করাতে। মেসোমশাই বলে ডেকে এমন ব্যবহার করেছিলেন যে তারাশঙ্কর মুগ্ধ। খাওয়াদাওয়ার পর বেরিয়ে আসার সময় সঙ্গে আসা তরুণ লেখককে আলাদা ডেকে তারাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। "তোমার বন্ধুর নাম কি বল তো? আগে দেখিনি। সম্ভবত তোমার মাসিমার আত্মীয়। তাঁকে তো নামটা বলতে হবে!"

শ্যামলদা কখন কি করবেন তা নিয়ে বন্ধুরা তটস্থ থাকতেন। যে স্কুলে তিনি পড়াতেন সেখানে যেতে প্রায়ই খুব দেরি হত। স্কুলের প্রধান শিক্ষক এ ব্যাপারে অনুযোগ জানানোয় তিনি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন পরের দিন ঠিক

সময়ে স্কুলে পৌঁছবেন। পরের দিন ক্লাস শুরু হওয়ার অনেক আগেই পৌঁছে গেলেন শ্যামলদা। প্রধান শিক্ষক খুব খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানাতে শ্যামলদা তাঁর পাঞ্জাবি খুলে বললেন, 'এই দেখুন, আমার গেঞ্জিটা ভিজে থাকায় আপনার তাগাদায় মায়ের ব্লাউজ পরে এসেছি।' প্রধান শিক্ষক এর পরে আর কোনও কথা বলতে পারেননি।

মাঝে মাঝে মনে হয় এই গল্পগুলোর অনেকটাই পরে বানানো হয়েছে। তিলকে তাল করা হয়েছে। খবর পেলাম শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষকে ঘুসি মেরেছেন শ্যামলদা। ওঁদের সম্পর্ক একসময় খুব ভাল ছিল। প্রতিভাবান তরুণ লেখককে ডেকে আনন্দবাজারে চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে সন্তোষদার একটা ভূমিকা ছিল। আমরা হতবাক হয়ে গেলাম এরকম আচরণে। বোধহয় এই কারণে শ্যামলদা চাকরি ছেড়ে দিলেন। তার কিছুদিন পরে অমৃত পত্রিকার দায়িত্ব নিয়ে চলে গেলেন শ্যামলদা। তখন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য কাগজটাকে দেশ পত্রিকার পাশে দাঁড় করানো। যেসব লেখক তখন আনন্দবাজারে লিখে একটু নাম করেছেন কিন্তু বড় সুযোগ পাচ্ছেন না তাঁদের ডেকে অমৃত পত্রিকায় সেই সুযোগ দিতে লাগলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে দীপালি দত্তরায়ের কথা মনে পড়ছে। মধ্যবয়সে লিখতে এসে এই ভদ্রমহিলা রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিলেন কয়েকটি গল্প এবং একটি উপন্যাসে। উচ্চবিত্ত সমাজের ছবি আঁকতে তিনি যে দক্ষ তা বোঝা যাচ্ছিল। শ্যামলদা তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অমৃত-এ লেখালেন। ওই সময় ওঁর আনন্দবাজার-দেশ-বিরোধী মানসিকতা সাগরময় ঘোষকে এমন বিরক্ত করেছিল যে তিনিও অমৃত পত্রিকার লেখকদের আর জায়গা দিতে রাজি হননি। এর ফলে বিব্রত দীপালি চিরকালের জন্য লেখা বন্ধ করে দিলেন। অন্তত আমার তো তাঁর লেখা কোথাও চোখে পড়েনি।

পরে শ্যামলদার সঙ্গে কথা বলেছি, সন্তোষদার সঙ্গেও। শ্যামলদা বলেছেন আমি সন্তোষদাকে ঘুসি মারিনি। আঙুলের ডগা দিয়ে ওঁর গালে ধাক্কা মেরেছিলাম। উনি আমার একটা লেখা নিয়ে গালাগালি দিচ্ছিলেন। ছয়বার গালাগালিটা শোনার পর ওঁকে সতর্ক করে আটবারের বার ওই কর্মটি করি। যাঁরা জল

মেশাতে অভ্যস্ত তাঁরা ওটাকে ঘুসি বলে প্রচার করে দিল। সন্তোষদাকে যখন প্রশ্নটা করেছি তখনই দেখেছি তাঁর মুখ লাল হয়ে যেত। গম্ভীর গলায় বলতেন, 'অন্য কথা বল।'

জীবনকে পাশবালিশের মতো সারা শরীর দিয়ে চটকেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তাই তাঁর আচরণের নানান ব্যাখ্যা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই অপব্যাখ্যা হওয়াও উচিত। কিন্তু একজন তরুণ বাঙালি লেখক যে বিরাট স্বপ্ন দেখতে চাইতেন তার পরিচয় আমরা পেয়েছি ওঁর চম্পাহাটি অভিযানে। কলকাতা থেকে বেশ দূরে প্রায় অজ পাড়াগাঁ হয়ে পড়েছিল চম্পাহাটি। শ্যামলদা সেখানে জলের দরে জমি কিনলেন, বন্ধুদের দিয়ে কেনালেন। সেখানে আধুনিক কায়দায় চাষ করা হবে মাঠে, পুকুরে মাছের উৎপাদন বিদেশি মতে হবে। সুন্দর রাস্তাঘাট থাকবে। নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমন কি পোস্টঅফিসের জন্যেও চেষ্টা করা হবে। পঁয়ত্রিশ বছর পরে এখন কোনও কোনও বাণিজ্যিক সংস্থা যে পরিকল্পনা নিচ্ছেন শ্যামলদা শূন্য হাতে তখন সেটা করার চেষ্টা করেন। বন্ধুদের অনেকেই রাজি হয়নি, কেউ কেউ হয়েছিল। ট্রেন খুব কম থামে বলে প্রচুর পোস্টকার্ডে জনতার দাবি ছাপিয়ে রেলওয়ে বোর্ডের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এসব করতে প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে। লেখালেখির পাশাপাশি এই স্বপ্ন সত্যি করার যে উদ্যোগ তিনি সে সময় নিয়েছিলেন তা বাঙালির চরিত্র-বিরোধী, বাঙালি লেখকের তো বটেই। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সাতষট্টিতে বাম রাজনীতি প্রবল হয়ে উঠল। গ্রামেগঞ্জে তার প্রতিক্রিয়ায় অনেক কিছুর মতো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্ন গেল চুরমার হয়ে। এখন সেখানে একটি রাস্তা পড়ে রয়েছে দু'পাশে আগাছা নিয়ে যার নাম শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় রোড। তবে হ্যাঁ, এখন ট্রেন আগের থেকে অনেক বেশি থামছে স্টেশনে।

শাহজাদা দারাশুকো, স্বর্গের আগের স্টেশন, হিম পড়ে গেল, হাওয়াগাড়ি থেকে শুরু করে হালের উপন্যাস আলো নেই পড়লে বোঝা যায় প্রচলিত লেখালেখির সঙ্গে কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায় এটা অন্য কারও কলম থেকে বের হয়নি। এখনকার অনেক লেখকই

এই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না।

আমার বিশ্বাস শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একটি পুরনো মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষের নাম। আর সেটাকে আড়াল করতে চিরকাল ধূলো এবং কাদা ছুঁড়ে গেছেন দু'হাতে। সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে শ্মশানে এবং পরে তাঁর শ্রাদ্ধে যে মানুষটি যেতে পারেন এক বুক কষ্ট নিয়ে তিনি কি সত্যিই তাঁকে আহত করতে চেয়েছিলেন? আবার দেশ পত্রিকায় সুনীলদার অর্ধেক জীবন যে সংখ্যায় প্রথম বের হল তার মুখবন্ধ লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। বহুদিনের বন্ধু ওঁরা। অনেক কর্মকান্ডে ওঁরা জড়িয়ে ছিলেন। লেখাটা চলছিল ভালই, হঠাৎ পড়লাম কোনও বৃষ্টির দুপুরে ট্যাক্সির মধ্যে বসে এক সুন্দরীর দুই গালে ওঁরা দুজন চুমু খেয়েছিলেন একসঙ্গে। বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেই হয়তো এই ঘটনার কথা লিখেছেন। কিন্তু আমি জানি, অনেক পাঠকেরই এটা পড়তে খারাপ লেগেছিল। ওই ঘটনা ঘটে থাকলেও তা এতকাল পরে তুলে ধরে বন্ধুত্বের গভীরতা বোঝানো নাকি বন্ধু সম্পর্কে পাঠকের মনে একটু বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে দেওয়া – এই নিয়ে কথাও উঠেছে। আমি মনে করি এরকম মতলব শ্যামলদার ছিল না। কোনও কিছু জাহির করার সময়ে বেশি নগ্ন হওয়ার যে প্রবণতা তাঁর আছে তাই তাঁকে ভুল বুঝতে সাহায্য করেছে।

এই লেখা শেষ করার আগে ওঁকে ফোন করেছিলাম। ওঁর কথাই তুলে দিচ্ছি, 'বুঝলি সমরেশ, কেউ নেই। চল্লিশের দশকের সব লেখক এখন অন্ধকারে। তার পরে যাঁরা এসেছিলাম তাঁরা এখনও ওই তিনজনকে অতিক্রম করতে পারিনি। অপরাজিত, পুতুল নাচের ইতিকথা, হাঁসুলিবাঁকের উপকথার কাছে আমাদের লেখাগুলো লিলিপুটের চেয়ে ছোট রে। আমরাও হারিয়ে যাব। ওই তিনটে বইকে যে অতিক্রম করতে পারবে সেই লেখক বেঁচে থাকবে। দেখিস!'

চার

কবিতা এবং উপন্যাস একই সঙ্গে চমৎকার লিখেছেন এমন মানুষের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। কোনও কোনও কবি যখন উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছেন তখন সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর চেষ্টাটাকেই বড্ড বেশি নজরে পড়েছে। গত দেড়শো বছরে যেসব বাঙালি কবিতায় সন্তুষ্ট না থেকে উপন্যাসে বিখ্যাত হতে চেয়েছেন তাঁদের কয়েকজনই অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই প্রসঙ্গে কোনও কথা বলার মানেই হয় না। উনিশ শো চল্লিশে যদি তিনি তিরিশ বছরের যুবক হতেন তা হলে সত্যজিৎ রায়ের আগেই আর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালককে আমরা পেয়ে যেতাম। শিল্পের সব শাখায় যাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ, তিনি নিশ্চয়ই চলচ্চিত্রকে কথা বলার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতেন।

তবু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে কিঞ্চিৎ বিরূপ কথাবার্তা কেউ কেউ বলেছেন। গল্প নিয়ে নয়, সেখানে তিনি আকাশছোঁয়া। যাঁরা কথাবর্তা বলেন তাঁদের জিভ সমসময় চুলকোয়, কথা না বললে বোধহয় অস্বস্তি হয়। আমরা এতদিনে জেনে নিয়েছি এদেশের কিছু অতিশিক্ষিত বন্ধ্যা মানুষ কিছু করতে না পেরে সমালোচক হয়ে যান। যে যত নাক উঁচুতে তুলতে পারবেন তিনি তত বড় সমালোচক।

কবি এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে যাঁদের নাম প্রথমেই মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে আছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং জয় গোস্বামী।

প্রেমেন্দ্র মিত্র অত্যন্ত ভাগ্যবান লেখক। এত কম লিখে এত বেশি পুরস্কার আর কেউ পেয়েছেন কি না জানি না। কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন যত তারচেয়ে বেশি পেয়েছেন ছোট গল্পকার হিসেবে। ওঁর প্রথম দিকের উপন্যাস 'পাঁক' এবং অচিন্ত্যকুমারের প্রথম উপন্যাস 'বেদে' পড়েছিলাম স্কুলের শেষ

ধাপে। কল্লোলের লেখক হিসেবে নিয়ম-ভাঙার লেখা হিসেবে এই দুটো উপন্যাস স্বীকৃত হয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার কবিতা লিখেছেন কিন্তু কবি হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। তাই তাঁকে এই আলোচনায় আনছি না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এমন কোনও উপন্যাস নেই যা তাঁকে এখন বাঁচিয়ে রাখবে। তিনি বেঁচে ছিলেন যখন তখনই এই সত্যটা জানা হয়ে গিয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম এবং শেষ পরিচয় হওয়া উচিত ছিল কবি হিসেবেই। কিন্তু উনি এমন একটি শিক্ষিত গদ্য লিখতেন যাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। উপন্যাস লিখেছেন বিস্তর। 'রাতভর বৃষ্টি' তো রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিল, আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছিল অশ্লীলতার দায়ে। কিন্তু তাঁর উপন্যাস সমগ্রর মধ্যে একমাত্র 'তিথিডোর' বেঁচে থাকবে কিছুদিন। প্রচুর ভাল কবিতার পাশাপাশি মাত্র একটি অনবদ্য উপন্যাস। তাঁর প্রবন্ধগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

জীবনানন্দ দাশ উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু লিখেছেন খুব সন্তর্পণে। মনে হয় কবির এ-ব্যাপারে কুণ্ঠা ছিল। হয়তো মান নিয়ে তিনি নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। যত দূর জানি তাঁর জীবদ্দশায় এই উপন্যাসগুলো প্রচারিত হয়নি। যেহেতু আমি জীবনানন্দের কবিতায় বেঁচে থাকার কারণ খুঁজে পাই, তাঁর কবিতার এক একটি লাইন আমাকে অপার প্রসন্নতা এনে দেয়, তাই উপন্যাসগুলো প্রকাশিত হওয়ামাত্র পড়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর পড়িনি। অথচ আমৃত্যু আমি ওঁর কবিতা পড়ে যাব, যতবার সম্ভব।

শক্তিদা খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনে কলম লিখতেন। তিনি যাকে পদ্য বলতেন সেখানে তিনি সম্রাট। কিন্তু তাঁকে উপন্যাস লিখতে হল। 'কুয়োতলা' পড়ে ভাল লেগেছিল। শুধুই ভাল লাগা। কেন উপন্যাস লিখছেন জিজ্ঞাসা করতে হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'পদ্য লিখে টাকা পাওয়া যায় না, তাই।" কিন্তু শক্তিদা বেঁচে থাকবেন তাঁর কবিতার জন্যে এই সত্যিটা তিনি নিজেই ভাল করে জানতেন। আমি একসময় শরৎ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার পাঠক ছিলাম। তার কারণ শরৎদার কবিতায় গল্পের গন্ধ থাকত। শরৎদা যখন উপন্যাস লিখতে

শুরু করলেন তখন সেই গন্ধটা চলে গেল। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমার প্রিয় কবি। ন্যাশনাল হাইওয়ে হল, কত লোক ভাল ভাল কথা বলল, কিন্তু একজন চাষী তার ধান শুকোবার জায়গা পেয়ে সবচেয়ে বেশি খুশি হল। এমন কবিতা তিনিই লিখতে পারেন। নীরেনদা উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর পিতৃপুরুষ অসাধারণ। কিন্তু তিনি বেছে নিলেন রহস্য বা গোয়েন্দা কাহিনীর ধারাকে। সেখানে কবিত্ব করার অবসর নেই। এইটে ওঁর চেয়ে ভাল খুব কম লেখকই জানেন।

এবার জয় গোস্বামী। জয়ের মতো কোনও কবি এত অল্পদিনে এত ভাল লেখা লেখেনি এবং খ্যাতি পায়নি। জয় মূলত লিরিক লেখে। ওর কবিতায় ও গল্প আঁকে। ওর কাব্যোপন্যাস অনবদ্য কারণ তার পরতে পরতে কবিতা রয়েছে। 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'কে কাব্যোপন্যাস বলা হয়েছে, 'মালিনী'কে বলা হয়নি কেন? অনেক আগে 'ধ্রুপদী' পত্রিকায় আনন্দ বাগচী ওইরকম একটি কাহিনী কবিতায় লিখেছিলেন। অনবদ্য। সুশীল রায় সম্পাদিত ওই কাগজে রচনাটিকে কি নাম দেওয়া হয়েছিল জানি না। আমি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত লেখাটির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতাম ছাত্রাবস্থায়। জয় এখন পর্যন্ত গদ্যে যা লেখার চেষ্টা করেছে তা ওর কবিতার মতো সাফল্য পায়নি। কবি যদি ঔপন্যাসিকের অভিভাবক হন তাহলে আর যাই হোক তা উপন্যাস হয় না। তবে জয় সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি। একটি কথা স্বীকার করছি, ওর কবিতার এক একটি শব্দে আমি নিজের মতো গল্প খুঁজে পাই।

কিন্তু এইসব কথাবার্তা যাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় তাঁর নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীলদাকে নিয়ে লেখার আগে এতগুলো কথা লিখতে হবে তা আমি ভাবিনি। আমি নিজে ভূমিকা পছন্দ করি না। এই লেখা শুরু করতে পারতাম এইভাবে, কেউ কথা রাখেনি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কি রেখেছেন? এ কথা সত্যি সুনীলদাই প্রথম সোজাসুজি কথা বলার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বাঙালি সাহিত্যিকরা আশ্রমের ব্রহ্মচারীমার্কা মুখ করে লেখালেখি করে গেছেন। যে-কোনও বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গেলে সেইসব নাদুস-নুদুস ব্রহ্মচারীর দর্শন পাওয়া যায় যাঁদের দেখলেই বুঝতে অসুবিধা হয়

না যে, এঁরা বেশ দুধেভাতেঘিয়ে রয়েছেন। আমাদের ওই সময়ের লেখকরাও জীবনে যত কুকীর্তি করুন না কেন নিজের সম্পর্কে লেখার সময় অম্বুবাচী করা বিধবার মতো কথা বলেছেন অথবা এইসব ব্রহ্মচারীর মতো জ্ঞান বর্ষণ করেছেন। নিয়মিত মদ্যপান করলেও পাঠকরা তাঁকে খারাপ ভাববে এই ভয়ে সেটা লিখতে পারেননি। সুনীলদাই প্রথম লিখতে পারেন, 'কাল রাত্রে একটু বেশী হুইস্কি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।' অতএব সুনীলদা -- সম্পর্কিত লেখা সরাসরি শুরু করাই ঠিক হত। মুশকিল হল, সুনীলদা নিজে বলেন, তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি কবি। কবিতা লেখেন। অতএব কবিদের উপন্যাস লেখার প্রসঙ্গ সহজেই এসে পড়ে। এবং সিদ্ধান্ত এইরকম, রবীন্দ্রপরবর্তী কবিকূলের মধ্যে যাঁরা উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন তাঁরা কবি হিসেবেই এখনও পরিচিত কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কতটা কবি হিসেবে আর কতটা ঔপন্যাসিক হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন তা নিয়ে এখন তর্ক করার কোনও মানে হয় না।

দেশ পত্রিকায় সুনীলদার 'অর্ধেক জীবন' বের হচ্ছে। তাঁর নিজের কলমে পাঠকরা অনেকখানি জেনে যাচ্ছেন। অতএব কিছু কথার পুনরাবৃত্তি হলেও হতে পারে।

আমরা অল্প বয়সে একটা তর্ক প্রায়ই করতাম। একজন লেখকের জীবনের প্রথম ভাগ কীরকম হওয়া উচিত। প্রচুর বিত্তের মধ্যে, আরামে থেকে নিয়ম করে লেখালেখি করলে পরবর্তীকালে তিনি আর একজন রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠবেন? নাকি প্রচন্ড অভাবের সঙ্গে লড়াই করে ডুবে যেতে যেতে শেষপর্যন্ত লিখে পাড়ে এসে পৌঁছবেন? সে সময় দ্বিতীয় ভাবনাটিকেই আমরা প্রাধান্য দিতাম। পৃথিবীর ইতিহাসে এইসব লড়াকু মানুষের কেউ কেউ বিরাট লেখক হয়েছেন। সত্যি বলতে কি রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরবাড়ির গল্প সে সময় আমাদের ঠিক পছন্দ হত না। মাস কয়েক আগে নিউ ইয়র্কের এক বাংলাদেশি বন্ধুর বাড়িতে আমি আতিথ্য নিয়েছিলাম। খুব ভাল মানুষ তাঁরা। গৃহকর্তার বাড়িভাড়া থেকে রোজগার হয়। স্ত্রী চাকরি করেন। ভদ্রলোক নিউ ইয়র্কের বাংলা পত্র-পত্রিকা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। দোতলার জানলার ধারে তাঁর লেখার টেবিল। শুনলাম,

প্রতিদিন তিনি সেখানে বসে সাহিত্যচর্চা করেন। এই মহৎ কর্মটি যাতে শান্তিতে করতে পারেন তার জন্যে ভদ্রলোকের স্ত্রী সবসময় উদ্বিগ্ন থাকেন। স্বামী লেখক বলে তাঁর মনে গর্ব আছে। পাশের জানলা দিয়ে আঙুরগাছ হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। যখন আঙুর পাকে তখন লেখক লিখতে লিখতে বাঁ-হাত বাড়িয়ে একটি ফল ছিঁড়ে মুখে দেন। এসব ব্যাপার চলছে অনেক বছর ধরে। নিজের পয়সায় লেখক কয়েকটি উপন্যাস ঢাকা এবং কলকাতায় প্রকাশ করলেও পাঠকরা এখনও তাঁর মূল্য বুঝতে পারছে না বলে লেখকের ধারণা। এরকম কোনও লেখকের কথা ছাত্রাবস্থায় শুনলে আমরা বিদ্রূপ মন্তব্য করতাম সন্দেহ নেই। এখন মনে হয় সে সময় আমাদের মধ্যেও গোঁড়ামি কাজ করত।

শ্যামপুকুরে আমি যে-বাড়িতে থাকি তার কয়েকটি বাড়ি দূরে একসময় সুনীলদা থাকতেন। তখন তাঁর বাবা স্কুল শিক্ষক। পঞ্চাশ বছর আগে একজন সৎ শিক্ষকের আয় কীরকম ছিল তা আমরা জানি। পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা পরিবারটির অনেকগুলো মুখ একটি মাত্র মানুষের রোজগারে ছোট ফ্ল্যাটে যেমন থাকতে পারে তেমনই ছিল। সে সময় এ-পাড়ার কিশোর অথবা তরুণ ছেলে হিসেবে যারা ডাকসাইটে ছিল এখন তারা প্রবীণ। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সুনীলদার প্রসঙ্গ জানতে চেয়েছি। জেনেছি, মুখচোরা একটি কিশোর পাড়ায় থাকত, ব্যস, এটুকুই।

সেই কিশোর কবিতা লিখত। কী কবিতা? ওইরকম অভাবী পরিবারে মানুষ হয়ে ওই বয়সে কবিতা কি করে মাথায় আসে? স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার পর (নাকি, ম্যাট্রিক?) পিতৃদেব আদেশ করলেন, দুপুরে বাড়িতে থেকে রোজ টেনিসনের একটি করে কবিতা বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। ওই সময়টায় নাকি ছেলেদের বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় তাই বাড়িতে আটকে রাখার চেষ্টা। সুনীলদা রোজ টেনিসনের কবিতা বাংলায় লিখছেন এবং সন্ধেবেলায় পিতৃদেব সেটা পরীক্ষা করছেন। তিন-চারদিন পরে সুনীলদা লক্ষ করলেন পিতৃদেব কবিতা না পড়ে লাইন গুণে নিশ্চিন্ত হচ্ছেন পুত্র কাজ করেছে। টেনিসনের কবিতা ওঁর ভাল লাগছিল না। এবার সেই কবিতার লাইন মেপে ছেলে যে

নিজের মনের কথা কবিতায় লিখছে এটা পিতৃদেব আর টের পেলেন না। তিনি লাইন ঠিক আছে জেনেই সন্তুষ্ট। এই অনুশীলন পরবর্তীকালে কতটা কাজ দিয়েছিল তা গবেষকরা বলতে পারবেন কিন্তু ওই অল্প বয়সে 'দেশ'-এ ওঁর কবিতা ছাপা হয়ে গেল। আমি সবসময় দেখে আসছি কবিরা কখনও একা থাকে না। খুব দ্রুত তাদের এক একটা দল তৈরি হয়ে যায়। সুনীলদার সঙ্গী জুটল। তাঁরও কবিতা-ভাবনা খুব তীব্র। এবং সেটা প্রকাশের জন্যে একটা পত্রিকার প্রয়োজন। যার বাড়িতে অনটন তীব্র হয়ে উঠেছে তার পক্ষে পত্রিকা বের করার স্বপ্নই বোধহয় দেখা সম্ভব।

কিন্তু কাগজ করতে টাকার দরকার। সেটা ওদের নেই। তখন নাভানার রমরমা অবস্থা। শুদ্ধ সাহিত্যের প্রকাশনার আর এক নাম সিগনেট। তাঁর কর্তা দিলীপকুমার গুপ্ত একটি খ্যাতনামা বিজ্ঞাপন সংস্থারও বড়কর্তা। এরকম মানুষের কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, ওঁরা চলে গেলেন দিলীপকুমারের কাছে। বালখিল্য-আস্পর্ধা বলে তাড়িয়ে দিলেন না তিনি। মন দিয়ে সব শুনলেন। বললেন, "তোমরা যদি কাগজ করো তা হলে সেই কাগজে বিখ্যাত লেখকদের লেখা থাকবে কেন? তোমাদের বয়সীদের প্ল্যাটফর্ম হোক সেই কাগজ।" কাগজ এবং ছাপার ব্যবস্থা করে দিলেন। কী নাম হবে সেই কাগজের? দিলীপকুমারই প্রস্তাব দিলেন, "নাম দাও কৃত্তিবাস।"

কৃত্তিবাস এখন ইতিহাস। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে লিখতে গেলে এই পত্রিকা এবং তার লেখকদের উপেক্ষা করার কোনও উপায় নেই। একদল তরুণ লেখক কবি এক জায়গায় জোট বাঁধল নতুন ধরণের সাহিত্য করবে বলে। পুরনো নিয়ম ভেঙে লিখতে গেলে জীবনযাপনের ধরণও বদলাতে হয়। এঁদের আচার-আচরণের সঙ্গে বাবু হয়ে থাকা বাঙালির কোনও মিল নেই। এঁদের দৌলতে আমরা খালাসিটোলা-বারদুয়ারি চিনলাম। জানলাম বিখ্যাত মানুষেরা সেখানে গিয়ে বাংলা মদ খেতে খেতে কাম্যু, ব্রেখট, বোদলেয়ার থেকে শুরু করে সমসাময়িক বিদেশি শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে আলোচনায় বুঁদ হয়ে থাকেন। এতকাল আমরা জানতাম যারা বাংলা মদ খায় তাদের পকেটে

পয়সা যেমন কম তেমনই রুচিও নিম্নশ্রেণীর। বাংলা মদের সঙ্গে খিস্তি-খেউড় ভাল মানায়, চিৎকার এবং একটু-আধটু মারপিট চমৎকার মেলে। কিন্তু কমলকুমার মজুমদারের মতো প্রাজ্ঞ মানুষ মৃদু হেসে যখন বলেন, "বাবু বড় অভিমানী", তখন সব গোলমাল হয়ে যায়।

কৃত্তিবাসের নেতৃত্বে তখনই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে শক্তিদা, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আরও অনেকে। সে সময় কৃত্তিবাস রীতিমতো অহঙ্কারী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, "বুর্জোয়া কোনও প্রতিষ্ঠান যদি সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা করে তা হলে কৃত্তিবাসের কেউ সেই পুরস্কার গ্রহণ করবে না।" এবারের বইমেলা থেকে বেরিয়ে একটি পানশালায় বসে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বললেন, "সুনীল কথা রাখেনি।"

টাকার জন্যে সুনীলদা তখন একটার পর একটা কাজ করছেন। সবই অল্প মেয়াদের কাজ। ছাত্রী পড়ানো থেকে খবরের কাগজে প্রুফ দেখা। কিছু টাকা বাড়িতে দিতে পারলে বোধহয় এক ধরণের গ্লানি একটু কমত। কিন্তু তখন মাথায় পোকা ঢুকে গেছে। প্রায়ই ওরা কলকাতা থেকে পালাতেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে কফি হাউসে আড্ডা দিতে গিয়ে হুট করে চাইবাসায় চলে যাওয়ার অভ্যেস তৈরি হয়ে গেল। বিহারের ওই অঞ্চলটা কেন ওঁদের এত টানত জিজ্ঞাসা করায় শক্তিদা বলেছিলেন, "দারুণ মহুয়া পাওয়া যায়। চমৎকার।" সারা বছর মহুয়া পাওয়া যায় কি না জানি না কিন্তু তাড়ি বা চোলাই-এর অভাব ছিল না। ওঁদের এই সময়ের কাহিনী প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লিখেছেন। সুনীলদার ' অরণের দিনরাত্রি' যে ওই অভিজ্ঞতার একটু ভদ্র সংস্করণ তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তখন 'দেশ'পত্রিকায় কবিতা ছাপা হত কোনও গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ শেষ হওয়ার পর যে-জায়গাটি খালি থাকত তা ভরতি করার জন্য। কবিতাকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হত খুব নামকরা কবির ক্ষেত্রে। ষাটের দশকে শুনতাম বুদ্ধদেব বসুকে একটি কবিতার জন্যে এক হাজার টাকা সম্মানদক্ষিণা দেওয়া হত। সত্যি মিথ্যে জানি না। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে যেহেতু 'দেশ' পত্রিকায়

গদ্যের পায়ের তলায় কবিতা ছাপা হত তাই শক্তিদারা তাকে পদ্য বলতে শুরু করলেন। এই পদ্যকে সম্মান দিতে হবে, তার জন্যে আলাদা পাতা চাই — এই রকম দাবি নিয়ে সুনীলদারা সাগরদার কাছে হাজির হয়েছিলেন। এবং সাগরময় ঘোষ সেই দাবী শুধু মেনে নেননি, পরবর্তীকালে কবিতার জন্যে বিশেষ অলংকরণের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

কৃত্তিবাস-কেন্দ্রিক যে-সাহিত্য আন্দোলন তা কখনও মাত্রা ছাড়ায়নি। প্রায় কাছাকাছি সময় হাংরি জেনারেশনের পরিকল্পিত অশ্লীলতা কৃত্তিবাস গোষ্ঠী এড়িয়ে চলত। সাহিত্য পাঠকের মনে পাঁকের গন্ধ ছড়ালে পাঠক তাকে ধুয়ে ফেলতে দেরি করবে না। সাহিত্য পাঠে হৃদয় প্রসন্ন না হলে লেখকের আয়ু বাড়বে না। এই সত্যিটা বিভূতিভূষণ তাঁর সারাজীবনের রচনায় আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু হাংরি জেনারেশন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে। শক্তিদা বা সন্দীপনদা যে কিঞ্চিত আকর্ষণ বোধ করেছিলেন পরে ভুল বুঝতে পেরে সরে এসেছিলেন তাতে আমরাই উপকৃত হয়েছি। কৃত্তিবাস কিন্তু এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়নি।

এই সময় পর্যন্ত সুনীলদার পরিচয় কবি হিসেবেই। তারপর হঠাৎ আমন্ত্রিত হয়ে তাঁকে যেতে হল আমেরিকায়। সেখানে লেখক অধ্যাপক ছাত্রদের সঙ্গে মতবিনিময় তাঁকে অনেকটাই প্রভাবিত করল। গিন্‌সবার্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব ওঁর পক্ষে মূল্যবান ছিল। গিন্‌সবার্গ চাইতেন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শত্রুতা নয়, প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছতে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করলে জেতার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাকে জয় করলে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা সহজ হয়। এই সত্যিটা হাংরি জেনারেশনের লেখকরা বুঝতে পারেনি বলে আজ তারা নিশ্চিহ্ন, এই সত্যিটা শাস্ত্রবিরোধীরা বড্ড দেরিতে বুঝতে পেরেছিলেন বলে দু-একজন এখনও টিকে আছেন।

আমেরিকায় সুনীলদার যে-জীবনযাপন, মধ্যবিত্ত বাঙালির যে অকারণ সঙ্কোচ ন্যাতার মতো মনে জড়িয়ে থাকে, তা দূর করতে সাহায্য করল। ফিরে

আসার পর মাথায় একরাশ লেখা চাপ দিচ্ছে আর অর্থাভাব একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। অতএব টাকার জন্যে গদ্য লেখা শুরু হল। আনন্দবাজারে পর পর বেরুতে লাগল নীললোহিতের রচনাগুলো। এখানে একটা কথা বলা দরকার। নীললোহিত অথবা নীলু আমাদের চারপাশে যেসব সাধারণ ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে তাই সে আমাদের দেখাল, দেখতে গিয়ে আমরা বৈচিত্র্য খুঁজে পেলাম। নীলু হয়ে গেল আমাদের ভাই অথবা বন্ধু। ওই যে সেই রচনাটি, কত বছর আগে পড়েছি, সেটা ছিল এইরকম : পুজোর আগে নীলু যার কাছেই যাচ্ছে জানতে পারছে কেউ দার্জিলিং কেউ দিল্লি নিদেনপক্ষে দেওঘর বেড়াতে যাচ্ছে। যেহেতু নীললোহিতের পকেটে পয়সা নেই, কোথাও যাওযার প্রশ্ন ওঠে না তাই তার সিদ্ধান্ত সবাই যদি কলকাতা ছেড়ে পুজোর সময় চলে যায় তা হলে সন্ধের সময় গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে কলকাতার সুন্দরীদের দেখবে কে? আমরা তখন ওই বয়সের না-তরুণ না-যুবক। ফলে মনে মনে নীলু হয়ে যেতে দেরি হল না। লক্ষ করছিলাম প্রতি ফিচারে একটি ছোটগল্পের স্বাদ থাকছে। এ সময় টাকার জন্যে একই পত্রিকায় অন্য লেখা লিখতে সুনীলদাকে আরও কয়েকটি ছদ্মনাম নিতে হয়েছিল। সনাতন পাঠক বা নীল উপাধ্যায়-এর মধ্যে প্রথম জন পাঠকদের প্রিয় হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি।

এই গদ্য রচনাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রথম লাইন থেকেই লেখক পাঠকের ঘাড় ধরে পড়িয়ে নিয়ে যান শেষ লাইন পর্যন্ত। কোথাও জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা নেই, বলার ভঙ্গি এত সহজ এবং আন্তরিক আর সেই সঙ্গে একটা কৌতূহলকে ভেতরে ভেতরে ছড়িয়ে দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত না পড়ে ছাড়া যায় না।

হাতেখড়ি তো হয়ে গেল। সুনীলদা তদ্দিনে একটি উপন্যাস লিখেছেন কোথাও প্রকাশ করতে সাহস পাননি। নিজেরই মনে হয়েছে, ঠিক হয়নি। তা ছাড়া একজন নবীন লেখকের উপন্যাস চট করে কোন প্রকাশক ছাপতে চাইবেন? বাংলা সাহিত্যে তখন বিখ্যাত লেখকদের সন্নিবেশ। দেশের পুজো সংখ্যায় একটি মাত্র উপন্যাস ছাপা হয়ে আসছিল। তা কখনও তারাশঙ্করের, কখনও নারায়ণ গাঙ্গুলির এবং তরুণ লেখক সমরেশ বসুর। সাগরদা ঠিক করলেন উপন্যাসের

সংখ্যা বাড়াবেন। প্রতি বছর একজন নবীন লেখককে সুযোগ দেবেন আত্মপ্রকাশের। তখন ছোটগল্প লিখে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়। পরপর তিন বছর, সেটা পঁয়ষট্টি সাল, এই তিনজন দেশের পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লিখলেন। প্রথমে সুনীলদা, বের হল 'আত্মপ্রকাশ'। প্রথম উপন্যাসেই সেঞ্চুরি বললে কম বলা হবে। পাঠকদের পড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতার সঙ্গে এই উপন্যাসে এক অনাবিল সারল্য আবিষ্কৃত হল যার টান এড়ানো মুশকিল। এক সদ্য যুবকের অন্যরকম জীবন এবং হতাশার মধ্যে বাস করেও যে মোটেই হতাশ নয় তার কথা অত্যন্ত আন্তরিক বলে মনে হল বাঙালি পাঠকের। এরপরে সুনীলদাকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

এই পর্যন্ত যা লিখলাম তা লিখতে কোনও বাধা আসার কথা নয়। তবে এ দেশের নিয়ম হল কোনও জীবিত মানুষের জীবন নিয়ে লেখালেখি না-করা। কেউ লিখলে তার হাজার মানে টেনে বের করে অকারণে পরিবেশ নষ্ট করার লোকের অভাব নেই। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে লেখার একটা সুবিধে আছে। ব্যক্তিগত জীবনে এই মানুষটাকে আমি কখনও রাগতে দেখিনি। অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্যও চুপচাপ শুনে বলেছেন, ছেড়ে দাও। তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছেন। অতএব চারদিকে চাউর হয়ে গেল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মোটেই রাগক্ষোভ পুষে রাখেন না। যদি ব্যাপারটি সত্যি হয় তা হলে বলব এই স্তরে অনেক সাধুসন্ন্যাসীও বিস্তর সাধনার পরে পৌঁছতে পারেন না। সুনীলদাই লিখেছিলেন সংসারে একজন সন্ন্যাসীর কথা। চট করে তাই মনে পড়ে। ব্যতিক্রম তো থাকবেই। অবশ্যই কেউ কেউ বলেন, এটা একটা ভণিতা হতে পারে। উনি মুখে কিছু বলেন না।

কিন্তু গত ত্রিশ বছরে আমি তাঁর মধ্যে দুটো মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ করেছি। একটি আমাদের উত্তর কলকাতার রকে বসা স্বাভাবিক গলা, এক ভাঁড় চা হোক জাতীয় কথা যে বলতে পারে। অন্যটি ধীরে ধীরে একটার পর একটা স্তর পেরিয়ে ওপরে উঠতে থাকা মানুষ। ইংরেজিতে যাকে সোস্যাল ক্লাইম্বার বলা হয় তা তিনি নন। কিন্তু গিনসবার্গের তত্ত্ব মেনে নিয়ে সংস্কৃতি এবং

বিত্তের সমন্বিত জগতের শীর্ষে উঠতে চাওয়া একজন, যে-ভূমিকায় তাঁর আগে কোনও বাঙালি লেখক পৌঁছতে পারেননি। অথচ সুনীলদা এখনও লেখেন তাদের কথা যারা স্বপ্ন দেখে।

বাংলা ভাষায় লেখালেখি করেও সুনীলদা সম্ভবত পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ দেশে আমন্ত্রিত হয়েছেন বারংবার। তাঁর সমসাময়িক অথবা পূর্ববর্তী লেখকদের কেউ এই সৌভাগ্য অর্জন করেননি। বিদেশের বাঙালিরা তাঁদের অনুষ্ঠানে বাঙালি লেখকদের আমন্ত্রণ করতে পারেন কিন্তু সুনীলদার যোগাযোগ শুধুই বাংলা ভাষাভাষীদের সঙ্গে নয়। এই যে বারংবার বিদেশে যাওয়া, এ দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে বেড়ানো, এসব সত্ত্বেও যে মানুষটি দু'হাতে লিখে চলেন তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে পারা যায় না। লেখার ব্যাপারে তিনি ডিসিপ্লিন মেনে চলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। যে কোনও সম্পাদকই জানেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঠিক সময়ে লেখা দেবেন তা তিনি চিনেই থাকুন অথবা ইস্তাম্বুলে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই ওঁর সঙ্গে ওখানকার কবি বুদ্ধিজীবীদের ভাল যোগাযোগ ছিল। স্বাধীনতার পর হুমায়ুন আহমেদের উত্থানের আগে পর্যন্ত শরৎচন্দ্র এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। দু'দেশের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন তাঁকে ঘিরে শুরু হয়েছিল বললে অতিকথন হবে না।

প্রকাশনা যে একটা ব্যবসা এবং বই বিক্রি থেকে লেখকের রোজগার হয় এ কথা বোধহয় সুনীলদা মাঝেমাঝেই খেয়ালে রাখেন না। তার ঠিকঠাক বইয়ের সংখ্যা কত, কারা কারা তাদের প্রকাশক এটা তিনি নিজেই জানেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। সেদিন এক নবীন প্রকাশক এল। বই ছাপতে চায়। বলল, সুনীলদার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে দুটো উপন্যাস ছাপতে দিয়েছেন। আমার পাশে একজন বই পড়ুয়া বসেছিলেন। তিনি বললেন ওই উপন্যাস দুটি গত বইমেলায় তিনি কিনেছেন। অর্থাৎ সদ্য গজিয়ে ওঠা কোনও প্রকাশক ওঁর অনুমতি নিয়ে বই ছেপে আর যোগাযোগ করেননি এবং তিনি ঘটনাটা মনে রাখার প্রয়োজন মনে করেননি। বছর কয়েক আগে বাংলাদেশের

একজন প্রকাশক আমার কাছে এলেন একটা কাগজ নিয়ে যাতে লেখা আছে নিম্নলিখিত বইগুলি অমুককে ছাপতে দিলাম। তলায় দুটি উপন্যাসের নাম লেখা। ধীরে ধীরে ওই প্রকাশক সেই কাগজে যতটা জায়গা ফাঁকা ছিল ততটা জায়গায় একের পর এক উপন্যাসের নাম লিখে গেছেন। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং অমুক সম্পাদিত কোনও সংকলনগ্রন্থ বের হচ্ছে। ওই অমুকই সব করছেন। সুনীলদা কোনও খবরই রাখেন না। আমার একটি গল্প ওইরকম সংকলনে বিনা অনুমতিতে ছাপা হয়। জানতে পারার পর প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয়েছিল, কারণ সুনীলদার নাম ছিল প্রথম সম্পাদক হিসেবে। এই অব্যবসায়িক ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যখন সুনীলদাদের বেশ কিছু বই বিশ্ববাণী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

হ্যাঁ, এটা ঠিক এ ব্যাপারে সতর্ক হলে সুনীলদার রোজগার অনেক বেড়ে যেত। কয়েকটি বড় প্রকাশনের প্রফেশন্যাল অ্যাটিচুড, কাগজের টাকা, সিনেমা-সিরিয়ালের কারণে পাওয়া অর্থ যোগ করলে কলকাতার কয়েজন লেখকের, লেখা ছাড়া অন্য কোনও কাজ করার প্রয়োজন পড়ে না। আর এঁদের পুরোধায় যখন সুনীলদা রয়েছেন তখন ওঁকে কেন চাকরি করতে হবে? চোদ্দো বছর আগে যখন আমি চাকরি ছেড়েছিলাম তখনই সুনীলদাকে প্রশ্নটা করেছিলাম। বলেছিলাম, "চাকরি না করলে যে সময়টা পাবেন তাতে আরও মন দিয়ে লিখতে পারবেন।" সুনীলদা একমত হয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, "আমাকে তো তেমন কিছু এখানে করতে হয় না, চলে যাচ্ছে যখন, এভাবেই চলুক।"

এই যে কাজুয়াল অ্যাপ্রোচ এটাও তাঁর চরিত্রের একটি দিক।

সুনীলদার ছোটগল্প খুব বেশি নেই। যেগুলো আছে তাদের বৈশিষ্ট্য আলাদা। 'গরম ভাত ও ভূতের গল্প' এর কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। ওই গল্পে অন্নের জন্যে যে-হাহাকার তা ছাপিয়ে আর এক অতীন্দ্রিয় কষ্ট আমাদের আক্রান্ত করেছে। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে যখনই সুনীলদা সিরিয়াস হয়েছেন তখনই অতীত তাঁকে উৎসাহিত করেছে। 'আমিই সে' নামে একটি উপন্যাস সেই কোন আদিমকালের মানুষের মধ্যে আজকের আমাকে দেখতে পেয়েছিলাম।

'আত্মপ্রকাশ', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সাদা বাড়ি কালো রাস্তা' সুনীলদাকে বিখ্যাত করেছে কিন্তু স্থায়িত্ব দেবে না। 'সেই সময়,' 'পূর্ব পশ্চিম,' 'প্রথম আলো' তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে অনেককাল। প্রশ্নটা এখানেই।

'সেই সময়' এবং 'প্রথম আলো'য় চলে যাওয়া সময়টাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন সুনীলদা। গত দুই শতাব্দীর বিখ্যাত মানুষদের সম্পর্কে আমরা অভ্যেসে যে শ্রদ্ধাজনিত ধারণা তৈরি করে লালন করে এসেছি, অথবা এখন বলা যেতে পারে, আমাদের মনে পন্ডিতরা যা ঢুকিয়ে দিযেছিলেন, সুনীলদা তথ্যপ্রমাণ দিয়ে উপন্যাসে তাদের রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে উপস্থিত করেছেন। হইচই হয়েছে। কিন্তু সেটা ধোপে টেঁকেনি।

কিন্তু বারংবার কেন সুনীলদাকে ইতিহাসের দরজায় ধাক্কা মারতে হচ্ছে। যা ছিল গবেষকের কাজ তা ভাষা এবং বলার ভঙ্গিতে স্বকীয়তা থাকায় সুনীলদা অনবদ্য করেছেন। 'পূর্ব পশ্চিম' - এর অনেকটাই তো চলে যাওয়া সময়ের কাহিনী। বাংলাদেশের কুড়ি বাইশ বছরের অনেক ছেলেমেয়ের কাছে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ বহু দূরের ঘটনা। অতএব প্রশ্ন ওঠেই, এই সময় নিয়ে সুনীলদা কেন ক্লাসিক উপন্যাস লিখছেন না? বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে ক্ষমতাবান লেখক কেন বর্তমানকে এড়িয়ে যাচ্ছেন? 'পথের পাঁচালী - অপরাজিত', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা-গণদেবতা', 'পুতুল নাচের ইতিকথা-পদ্মানদীর মাঝি'র মতো তাঁর কোন উপন্যাসকে পরবর্তী প্রজন্ম মনে রাখবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে সুনীলদা কী বলতে পারেন আমি জানি। সুনীলদার সম্ভাব্য উত্তর হবে খুবই কাজুয়াল, "যা মনে এসেছে লিখেছি, যা লিখতে ভাল লাগছে তা লিখে যাচ্ছি, কালের কাছে পরীক্ষা দিতে হবে বলে তো লেখালেখি করি না। একশো বছর পরে কেউ পড়লে ভাল, না পড়লে আমার কি এসে যায়? আমি তো সেটা দেখার জন্যে পৃথিবীতে থাকব না!"

হ্যাঁ, সুনীলদা এ ধরনের কথা বলতেই পারেন। কিন্তু কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছেন। তিনি যখন নীরা বিষয়ক কবিতাগুলো লিখছিলেন

তখন যে বাঙালি পাঠক তাঁকে ঘিরে হইচই করেছে তারা এখন শুধুই প্রশ্ন করে, নীরা কে? কেউ সত্যি ছিল কি না। এইটুকু।

একসময় এবং এখনও, এই ব্যাপারে সুনীলদাকে আমি ঈর্ষা করতাম। শুধু কবিতা লেখার জন্যে কলকাতার তামাম সুন্দরীরা সুনীলদাকে ঘিরে থাকত। সুন্দরীদের বোধহয় সময় কম, কষ্ট করে গদ্য পড়তে চাইতেন না। তখন মনে হত, হায়, যদি কবিতা লিখতে পারতাম! এখন ওই একই ব্যাপার জয় গোস্বামীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে।

কিন্তু নারীর প্রতি সুনীলদার আকর্ষণ এখনও তীব্র। এই তীব্রতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যতদিন এটা থাকবে ততদিন তিনি সৃষ্টিশীল থাকবেন।

তবে ইদানীং, নারী ছাড়া সুনীলদাকে অন্য ক্রিয়াকর্মে ব্যস্ত হতে দেখছি। সভাসমিতি তো ছিল, নানান আন্দোলনে তাঁকে নেতৃত্ব দিতে দেখছি। শাসকদলের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা অনেককে অস্বস্তিতে ফেলছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কি শেষ পর্যন্ত আচার্য অথবা গুরুদেবের ভূমিকায় নিজেকে দেখতে চান? বাংলা ভাষা নিয়ে তিনি যদি কোনও আন্দোলন করেন তা হলে যে কোনও বাঙালির উচিত তাঁর পাশে দাঁড়ানো।

তাই মাঝে মাঝেই মনে হয়, একটা কিছু করতে হয় বলেই করে যাওয়া। এই বয়সে এসে হঠাৎ নাটক করার মতো। তাঁর আসল লেখাটা তিনি এই অর্ধেক জীবনে লেখেননি। ওই জীবন থেকে নির্লিপ্তের মতো যা সঞ্চয় করেছেন তাই দিয়ে বাকি জীবনে লিখবেন তাঁর সময়ের উপন্যাস।

কার্জন পার্কে বিমলদার আড্ডায় অনেকেই আসতেন। আমরা যারা নিয়মিত হাজিরা দিতাম তারা উটকোদের সন্দেহের চোখে দেখতাম। নতুন কারও গল্প 'দেশ' পত্রিকায় বের হলে তিনি মনে করতেন ওই আড্ডায় ঢোকার ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। শিশিরদা চেষ্টা করেও কাউকে কাউকে তাড়াতে পারেননি।

লিকলিকে রোগা, একটি পায়ের অবস্থান ঠিকঠাক নেই, চশমার আড়ালে চোখ দুটো বেশ বুদ্ধিদীপ্ত একজনকে নিয়ে কে যে আমাদের আড্ডায় এসেছিলেন আজ মনে নেই। শুনলাম ইনি এক মন্ত্রীমশাইয়ের ভাষণ লেখার চাকরি করেন।

বিশাল বিশাল তাত্ত্বিক ভাষণ থেকে চুটকি ভাষণ সবই এঁর কলম থেকে বের হয়।

এ কথা ভাবার কোনও কারণই নেই সেদিন সঞ্জীব নেহাতই মফস্বলী লেখকের মতো আচরণ করেছিল। তার আগে সে দীর্ঘকাল সরকারি চাকরি করেছে, স্কুলে পড়িয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল একসময়। দেওঘরেই পড়িয়েছে। অতএব জীবন দেখেছে। কিন্তু ব্যবহার এবং কথাবার্তায় বিনয় শব্দটা যেন ঝরে ঝরে পড়ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প দপ্তরের সঙ্গে জড়িত বলে অনেক তথ্য ওর জানা ছিল। বিমলদার উৎসাহে 'দেশ'-এ ওর লেখা ছাপা হতে লাগল, 'জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ', সঞ্জয় ছদ্মনামে। সেই লেখা অত্যন্ত তথ্যনির্ভর, বাঙালি বেকারকে সাহায্য করার জন্যেই লেখা। 'হাইওয়ে' শিরোনামে একটি গল্প জমা দিয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। দীর্ঘ এক বছর ধরে যাতায়াতের পর বিমল কর ওকে বললেন, "আমরা তো কারও প্রথম গল্প ছাপি না, তুই আর একটা দে।' অর্থাৎ 'দেশ'-এ প্রকাশিত ওর প্রথম ছোটগল্প, 'চকমকি'।

তদ্দিনে সঞ্জীব আমাদের বন্ধু হয়ে গিয়েছে। ওর বাচনভঙ্গিতে এমন একটা সপ্রতিভতা ছিল যে না শুনে পারা যেত না। এই সময় ও লিখল 'শ্বেতপাথরের টেবিল'। এই একটি গল্প ওকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে দিল। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও গৌরী আইয়ুব চিঠি লিখে লেখককে অভিনন্দন জানালেন, সেটা ছাপা হল 'দেশ'-এর চিঠিপত্র কলমে। এবং এরপর সঞ্জীবকে দীর্ঘকাল ফিরে তাকাতে হয়নি।

একমাত্র রাজশেখর বসুই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছবার পর লিখে বিখ্যাত হন। সাধারণত তিরিশের অনেক আগে থেকেই এ দেশের লেখকরা আত্মপ্রকাশ করেছেন। রাজশেখর বসু বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের ধারাকে নতুন চেহারা দিলেন। শিবরাম চক্রবর্তীর জগৎ ছিল মূলত বালক এবং কিশোরের। সঞ্জীব রাজশেখর বসুর পথ ধরে অনেকটা এগিয়ে গেল। ফলে ওর সমসাময়িক লেখকদের থেকে ও একটা আলাদা জায়গায় থাকতে পারল। আর এখানেই

গোলমাল বাঁধল।

সঞ্জীব পেশাদারি মঞ্চে গল্প পড়েছিল সেই একাশিতে, রবীন্দ্রসদনে, তার পূর্বসূরী কজন বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবন নিয়ে লেখা ওই গল্প সে যখন পড়ছে তখন দর্শকরা প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। সে একটা লাইন পড়ছে আর দর্শকরা হাততালি দিচ্ছে। আগেই বলেছি ওর বাচনভঙ্গিতে শিক্ষিত কমেডিয়ানের উপস্থিতি টের পাওয়া যেত। সেই পঞ্চাশ-ষাটের দশকের বিচিত্রানুষ্ঠানে জহর রায় বা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করলে যে প্রবল হাততালি শোনা যেত সঞ্জীবের নাম পরবর্তীকালের অনুষ্ঠানে ঘোষিত হলে তারই পুনরাবৃত্তি হত। ওর এই জনপ্রিয়তা কাজে লাগাল কিছু ব্যবসায়ী। ঘন ঘন তাকে গল্প পড়তে দেখা গেল। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে তাকে প্রায় তারকা তৈরি করে দেওয়া হল। তারপর ব্যাপারটাকে আরও চমকপ্রদ করতে উদ্যোক্তারা তার সঙ্গে মহিলা শিল্পীকে যোগ করে দিলেন। এ সময় আমাদের কার্জন পার্কের আড্ডা ভেঙে গেছে। ওই পর্যায়ে সঞ্জীব কীরকম অর্থ উপার্জন করেছিল জানি না কিন্তু লেখক সঞ্জীবকে কথক সঞ্জীব বোধহয় ছাপিয়ে যাচ্ছিল।

'আকাশপাতাল' বা 'কলকাতা আছে কলকাতাতেই' ওর প্রথম দিকের ধারাবাহিক ফিচার। উপন্যাস নয়। দেশের ধারাবাহিক উপন্যাস 'লোটাকম্বল'-এ সঞ্জীব নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। অথবা 'শাখাপ্রশাখা' উপন্যাসে। কিন্তু ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছিল ও সাহিত্য থেকে সরে যেতে চাইছে। অনর্থক ব্যঙ্গ, তির্যক মন্তব্য, হাস্যরসের অকারণ পরিবেশন ওর মনঃসংযোগ নষ্ট হওয়ার কারণ বলে কেউ কেউ মনে করেন।

ওর বই বিক্রি অনেকের কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু প্রবল চাহিদার জোগান দিতে না-পেরে একই লেখা একাধিক বইতে ছাপার অনুমতি দিল বিভিন্ন প্রকাশককে। পাঠক বই কিনে ভাবতে লাগলেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন।

এই ভাবে কুড়ি-বাইশ বছরের মধ্যে জনপ্রিয়তা দখল করে অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ওঁর পক্ষেই সম্ভব। শুরুতে যখন ওর সঙ্গে আলাপ তখন

ওর মহিলাপ্রীতির নমুনা আমরা মাঝে মাঝেই দেখতে পেতাম। ওঁর লেখায় মুগ্ধ সুন্দরীরা চলে আসত আনন্দবাজার অফিসে। বিমলদার আড্ডায় মাঝে মাঝে যেসব বয়স্কা মহিলা আসতেন তাঁরা সঞ্জীবকেই বেশি পছন্দ করতেন।

অচিন্ত্যকুমার বলতেন, আমি বাঁ হাতে কামকৃষ্ণ লিখি, ডান হাতে রামকৃষ্ণ। জীবনী সাহিত্য গুলো তো অসাধারণ কিন্তু যা তিনি বাঁ হাতের লেখা বলেছেন তা আমাকে বেশী আপ্লুত করেছে। স্ত্রী বিয়োগের আগে থেকেই সঞ্জীবের মধ্যে যে অস্থিরতা চলছিল, এই ধরণের লেখালেখি সম্পর্কে ক্রমশ সে যে অনাগ্রহী হয়ে উঠছিল তা আমরা বুঝতে পারছিলাম। ওর চাকরির পরিবেশও সম্ভবত ওকে প্রীত করছিল না। সঞ্জীব রামকৃষ্ণদেবকে শেষ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিল। তাঁর সম্পর্কে অনেকবার বলা কথা সে নতুন করে বলতে শুরু করল। সে এখন যা লেখালেখি করে তার বেশির ভাগটাই রামকৃষ্ণদেব এবং সারদামনিকে নিয়ে। আজ সকালে টেলিফোনে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম। তার জবাব, "এতকাল মাছ বিক্রি করতাম এখন ফুল বিক্রি করি।"

মাছ যারা কেনে তারা কি ফুল কেনে না? নাকি যারা ফুল কেনে তারা কখনই মাছের দোকানে যায় না? এ প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই, যে যার মতো জীবনযাপন করবে সেটাই স্বাভাবিক। শুধু বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের রুগ্‌ণ ধারাটি উপেক্ষিত হয়ে থাকবে, এটাই শেষ কথা।

পাঁচ

যে কথা বলতে বাধো বাধো লাগে, শুধু বন্ধুদের কাছেই স্বচ্ছন্দে বলা যায় তাই এই শিরোনামে লিখতে চেয়েছি। পরিচিত লেখকদের কথা না বলে এবার শুরু করছি পশ্চিমবাংলার পাঠকদের নিয়ে।

আমি জানি সিনেমা নাটক যতটা না সময় কেড়ে নিতে পেরেছিল টিভি তার বহুগুণ সময় কেড়ে নেওয়ায় পশ্চিমবাংলার পাঠকদের বই পড়ার অভ্যেস কমে এসেছে। যেহেতু জনসংখ্যা বেড়ে গেছে প্রচুর তাই আমাদের বই বিক্রির

পরিমাণ এখনও চল্লিশ পঞ্চাশের অনেক লেখকের থেকে বেশি। সময় কমে গেলেও পশ্চিমবাংলার পাঠক বই পড়েন। কিন্তু কোন বই?

বই না পড়লে ঘুম হয় না এমন কিছু পাঠককে জানি যাঁরা তামিল তেলেগু দূরের কথা, হিন্দি ভাষার এখনকার বিখ্যাত লেখকদের কোনও লেখা পড়েননি। অসম বা ওড়িশার সাহিত্য সম্পর্কে কোনও খবর রাখেন না। যদি বলা হয় এর অন্যতম কারণ হল ভাষা না জানা তাহলেও মানা যাচ্ছে না সংখ্যায় সামান্য হলেও এইসব ভাষার বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার পাঠক ভুলেও সেগুলো কেনেন না। অথচ ওড়িশা বা অসমে আমাদের বই নিয়মিত বের হচ্ছে ওইসব ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে। ভারতের অন্য প্রদেশের পাঠকরা যখন আমাদের বই পড়ছেন তখন অন্য প্রদেশের লেখা এখানে বাংলায় ছাপা হচ্ছে না কেন? এখানকার প্রকাশকরা বলেন, ওসব বই কেউ কিনবে না।

যদি ধরে নিই অনুবাদ পড়তে পশ্চিমবাংলার পাঠকদের আগ্রহ নেই তাহলে মিথ্যে ভাবা হবে। প্রচুর ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ এখানে হু হু করে বিক্রি হয়েছে। চিনের লেখককে আমরা চিনেছি অনুবাদ পড়ে। আর হ্যারল্ড রবিন্স, জেমস হ্যাডলি চেজ তো একসময় মুড়ি-মুড়কির মতো বাংলায় বিক্রি হয়েছে। ফরাসি বা ইতালিয়ান উপন্যাসও ভাল বিক্রি হয়েছে বাংলায়।

অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা অস্বাভাবিক নয় যে পশ্চিমবাংলার পাঠক ভারতের অন্য ভাষার লেখালেখি সম্পর্কে আদৌ আগ্রহী নন। বিভিন্ন পত্রিকায় অন্য প্রদেশের গল্প কবিতা ছাপা হয়, পাঠকদের সেসব নিয়ে কথা বলতে শুনি না। এই কারণে একজন গুজরাতি অথবা তামিল পশ্চিমবাংলার পাঠককে কূপমন্ডুক ভাবলে প্রতিবাদ করা মুশকিল।

এই ব্যাপারটা আরও প্রকট হচ্ছে বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রতি পশ্চিমবাংলার পাঠকের অনীহা দেখে। এখানে তো অনুবাদের ঝামেলা নেই। তবু বাংলাদেশের লেখকদের বই এদেশীয় পাঠকরা কেনেন না কেন? যে লেখকের একটি বই ঢাকায় বছরে চল্লিশ হাজার কপি হু হু করে বিক্রি হয় তার বই এদেশের পাঠকের পছন্দ না হওয়ার তো কোনও কারণ নেই? কেউ কেউ

বলেছেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত বইয়ের দাম খুব বেশী । ওই দামে এদেশীয় পাঠক এখানকার লেখকদের দুটো বই পেয়ে যাবেন সমান মাপের। দেখা গেল, বাংলাদেশের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের বই কলকাতায় ছাপা হচ্ছে, দামও আমাদের বইয়ের মতো কিন্তু বিক্রি যা হচ্ছে তা বাংলাদেশে রপ্তানি করে।

একজন পাঠক আমাকে বলেছিলেন, "বাংলায় লেখা ঠিকই, কিন্তু কেমন কেমন। পূর্ববঙ্গের অনেক শব্দ ওখানে ছড়ানো। অস্বস্তি হয়। তাছাড়া দুলাভাই, আব্বু, আপা ইত্যাদি শব্দ বড় বিপদে ফেলে দেয়।"

তাঁকে যখন প্রশ্ন করি, "জামাইবাবু, পিসেমশাই, মাসিমা ইত্যাদি শব্দ, আমাদের পুজোআর্চ্চার বিবরণ থাকা উপন্যাস গুলো ওঁদের দেশের পাঠকরা যে পরিমাণ পড়েন তাতে কখনই মনে হয় না রসগ্রহণ করতে অসুবিধা হচ্ছে। ওঁরা পারছেন আপনি পারছেন না কেন?"

এবার ঝোলা থেকে বাঘ বেরিয়ে পড়ল। আমরা মুখে যতই অস্বীকার করি, পূর্ববঙ্গের পাঠকদের থেকে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকরা অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক। এখনও এদেশের অনেক মানুষ বলে থাকেন, আমরা বাঙালি ওরা মুসলমান। আর এভাবে গুটিয়ে নিতে নিতে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বলতে বাধলেও কথাটা বলা দরকার ছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে একসময় কিছু পত্র-পত্রিকা আসত কলকাতায়। যতদুর মনে পড়ছে তেষট্টি সালে আমি পূর্বদেশ নামের একটি পত্রিকায় শওকত ওসমানের একটি গল্প পড়েছিলাম। সেই তরুণ বয়সে আমি কী পরিমাণ মুগ্ধ হয়েছিলাম তা এখনও মনে আছে। ওই গল্পে একটি বর্ণনা এইরকম ছিল, "ঘষা আধুলির মত চাঁদটা এক লাফে নিষ্পত্র গাছটার ডালে উঠে বসল।" মানুষটির সঙ্গে আলাপ করতে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

মনে পড়ছে, সেটা সম্ভবত বিরানব্বই সালের ডিসেম্বর মাস। আমার ঢাকার প্রকাশক থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন ঢাকা ক্লাবে। রাতে শুতে শুতে দুটো আড়াইটে বেজে যেত। ওখানকার বন্ধুরা সেই সময় আমার ঘর থেকে বাড়ি ফিরতেন। ফলে ঘুম ভাঙত দেরিতে । এক সকালে দরজায় শব্দ হওয়ায় চোখ

মেললাম। চোখে তখন অথৈ ঘুম। উঠতে হল। বিরক্ত মুখে দরজা খুলে দেখলাম এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন, পরনে পাঞ্জাবি এবং পাজামা। পাজামাটি একটু ছোট। কাঁধে ঝোলা। বললেন, 'ভাই সমরেশ, তোমার ঘুম ভাঙালাম নাকি?'

যেন বহুকালের চেনা মানুষ, সম্পর্কটা গভীর, কথা বলার ধরণ এমনই। অথচ তাঁকে আমি কখনও দেখিনি।

বললাম, 'হ্যাঁ, মানে কাল রাত্রে —!'

ওহো! তাহলে তুমি আর একটু ঘুমিয়ে নাও ভাই, আমি বাইরে গিয়ে বসি।' ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন জানার পর আর যাই করি ঘুমোতে পারব না। অতএব চটপট জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি প্রয়োজন যদি বলেন —!'

এই সময় গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলাম ভদ্রলোককে দেখে কপালে হাত ছোঁয়ালেন, 'সেলাম আলিকুম।'

বৃদ্ধ সম্ভাষণটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কেমন আছ আজাদ?'

ম্যানেজার খুব বিনীত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সবাই ভাল আছে। আমার মেয়ে আপনার ছড়া খুব পড়ে।'

এবার বুঝলাম বৃদ্ধ লেখক, ছড়া লেখেন। অতএব খোলাখুলি বললাম, 'আমি কিন্তু আপনার পরিচয় এখনও জানি না।'

ম্যানেজার খুব অবাক হয়ে বললেন, 'মজুমদার সাহেব, আপনি ওঁকে চেনেন না? উনি শওকত ওসমান সাহেব।'

আমি হতবাক। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জড়তা কেটে গেল, দ্রুত ওঁকে প্রণাম করলাম। উনি মাথায় হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও ভাই।'

বললাম, 'না না। আমি ভাবতে পারিনি আপনাকে দেখতে পাব। আপনি যে আমার কাছে আসতে পারেন কল্পনাও করিনি। আসুন, আসুন ভেতরে।'

কেয়ারটেকারের কাছে বিদায় নিয়ে শওকত ওসমান আমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'তুমি আমার আত্মীয়। আমি বড়ভাই কারণ পৃথিবীতে আগে

এসেছি বলে তোমার আগে লেখার সুযোগ পেয়েছি। তোমার কাছে আমি আসব এটাই তো স্বাভাবিক।' বলতে বলতে তিনি ঘরের চেহারা দেখলেন।

গতরাত্রে বন্ধুরা চলে যাওয়ার পর ঘর পরিষ্কার করা হয়নি। তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব ভদ্রস্থ করে তাঁকে বসতে দিলাম। টেলিফোনে চায়ের অর্ডার দিয়ে বাথরুমে গিয়ে ভদ্রস্থ হয়ে বেরিয়ে আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী সাতই আগষ্ট লন্ডনে যা বলেছেন তা কাগজে পড়েছ?'

'না। কি বলেছেন?'

'পাঁচশো বছরেও দুই বাংলা এক হবে না।'

'আপনার প্রতিক্রিয়া কি?'

বৃদ্ধ হাসলেন। তারপর ছড়া বললেন,

'মার্কসবাদের হেঁসেলে ঢুকেছিল ছিঁচকে
যত সব কেটে সিঁদ,
এখন তারা চমৎকার গণতকার
সেজেছে হস্তরেখাবিদ।'

বললাম, 'আপনার সঙ্গে একমত নই। এখন বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র, আর দুই বাংলা এক বাংলা নয়। সুভাষচন্দ্র বসু যেমন বেঁচে থাকতে পারেন না সময়ের কারণে তেমনই আমাদের এক হওয়ার সময়টাও পেরিয়ে গেছে।'

তিনি মাথা নাড়লেন, 'হয়তো। আমি এখনও পুরোনো ভাবনা আঁকড়ে আছি। যাকগে, তোমাদের লেখালেখি আমরা পড়ছি। কিন্তু আমাদের লেখা তোমাদের হাতে পৌঁছায় না তা জানি। তুমি কি আমার কোনও লেখা পড়েছ?'

'নিশ্চয়ই।' আমি সেই পূর্বদেশের গল্পটা বলে জানালাম, 'আপনি প্রথম লেখালেখি শুরু করেন উনিশশো আটত্রিশ সালে। "বুলবুল" পত্রিকায় আপনার তিনটি কবিতা ছাপা হয়। চুয়ান্ন বছর হয়ে গেল। তাই না?'

শওকত ওসমান অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরার পর তাঁর হৃৎপিন্ডের শব্দ যেন আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কি লিখছেন?'

'সত্তার সঙ্গে সংলাপ। খবরের কাগজের পাতায় নিজের সঙ্গে কথা বলছি। আর লিখছি ছড়া।'

সেদিন কথা বলতে বলতে তিনি আমাকে কয়েকটি ছড়া লিখে দিয়েছিলেন। এই সুযোগে পাঠকদের কাছে সেগুলো পৌঁছে দিচ্ছি।

এক, বড় অসহায় রসুল ও আল্লা
যেদেশে সরকার খোদ মোল্লা।।

দুই, বৃদ্ধকালে বউ তালাক দেওয়া চলে
বন্ধুজনে দেওয়া মানে নির্ঘাৎ মরা
কী নিয়ে বাঁচব যদি, প্রস্রাবে নয়,
প্রাত্যহিকতায় না থাকে শর্করা?

তিন, মৌলবাদ আসলে মল-উৎপন্ন
ভেতরে রক্ত-জমাট ফলে কৃষ্ণবর্ণ।।

চার, আমি বেশ্যা
বেশ্যা আমার মা
বেশ্যা ছিলেন নানী
আমরা তিন পুরুষ পাকিস্তানী।।

স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে শওকত ওসমান ধর্মের বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। ওঁর এই কবিতাটি পড়ে আমি চমকে গিয়েছি। ঢাকায় যেখানে মৌলবাদীদের মিছিল যে কোনও বাহানায় হিংস্র হয়ে ওঠে সেখানে থেকে তিনি কী করে এই লেখা লিখলেন?

'মুসলমানদের ঘরে চুরির পর
ধরা পড়ে করিম হল, বদমাস চোর।
মুসলমানের ঘরে সেই অপরাধে
ধরা পড়ে গোপাল হল, হিন্দু খচ্চর।।
হিন্দুর ঘরে চুরির পর
ধরা পড়ে গোপাল হল, বদমাস চোর।

হিন্দুর ঘরে সেই অপরাধে
ধরা পড়ে করিম হল, মুসলমান খচ্চর।।
ধর্ম অনুসারে নির্ণয় হয়
যতো কাজের ধর্ম।
এদেশে হিন্দু মুসলমান হতে লাগে
আহম্মকি, অন্যায়, অপকর্ম, দুষ্কর্ম।।'

সেই সকালটা চমৎকার কেটেছিল। শুনলাম প্রায় দু মাইল পথ তিনি হেঁটেই এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। অনেকেই মুক্তমনের কথা বলেন কিন্তু শওকত ওসমান সেটা কাগজে-কলমে লিখে গেছেন।

একথা আজ অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবাংলায় যাঁরা এতকাল লেখালেখি করেছেন রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের পরে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকের নাম হুমায়ুন আহমেদ। এই জনপ্রিয়তা অবশ্যই বই বিক্রির ওপর ভিত্তি করেই বলতে বাধ্য হচ্ছি। একথাও ঠিক শরৎচন্দ্র, যাঁর বই রবীন্দ্রনাথের থেকেও অনেক বেশি বিক্রি হত তাঁকেও ছাপিয়ে গিয়েছে হুমায়ুন। একুশের মেলার সময় ওঁর অন্তত গোটা চারেক বই প্রকাশিত হয়। সেগুলো মেলা শেষ হওয়ার সময় অন্তত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। বইগুলো মূলত উপন্যাস। এই বইগুলো পাওয়ার জন্যে প্রকাশকেরা সারা বছর তদ্বির করেন। পশ্চিমবাংলার প্রকাশক কোনও লেখককে দশ হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন না। এই রীতি এখানে চালুই হয়নি। কিন্তু ঢাকার প্রকাশকরা একটি বইয়ের জন্যে হুমায়ুনকে দশ লক্ষ টাকা আগাম দিতে প্রস্তুত, দিয়েও থাকেন। হুমায়ুনের উপন্যাসগুলোর বেশীর ভাগই ছোট, দাম ষাট সত্তর টাকা থেকে বড়জোর দেড়শ। তাহলে কত বই বিক্রি হলে দশ লাখ টাকার আগাম লেখকের দক্ষিণা বাবদ উঠে আসে? এসব অঙ্কের কথা ভাবলেই মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।

হুমায়ুনকে আমি প্রথম দেখি বছর পনেরো আগে। সেবার প্রথম ঢাকায় গিয়েছি। একুশের বইমেলায় একটি যুবক এগিয়ে এসে আলাপ করল। রোগা,

খাটো, পাজামা আর হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরা যুবক খুব বিনয়ী। কেউ একজন ওর পরিচয় দিয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ায়, লেখে, বাংলাদেশ টিভিতে ওর লেখা নাটক 'এইসব দিন রাত্রি' খুব জনপ্রিয় হয়েছে। হুমায়ুন কথা বলছিল নিচু গলায়। তখন তাকে ঘিরে কোনও ভিড় ছিল না। পাশ দিয়ে যাঁরা বই কিনতে যাচ্ছিলেন তাঁরা ফিরেও তাকাচ্ছিলেন না। সেদিন হুমায়ুন বারংবার বিভূতিভূষণের কথা বলছিল। ওঁর বাংলা সাহিত্যের মহারথীদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে খুব ভাল লেগেছিল। সে আমার বইপত্তর পড়েছে বুঝতে পেরেছিলাম। ব্যাস, এইটুকু।

বছর চারেক পরে একুশের বইমেলায় ঢুকে দেখলাম বিশাল লাইন সাপের মতো এঁকেবেকে চলে গেছে। লাইনের শুরু কোনও স্টলের সামনে থেকে নয়। মেলা কর্তৃপক্ষ একটি অফিসঘরের বারান্দায় ব্যবস্থা করেছেন লেখকের জন্যে, সেখানে বসে তিনি ভক্তদের কেনা বইতে সই দেবেন। হাজার দুয়েক লোক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন কখন তিনি সুযোগ পাবেন। শুনলাম, আগের বারের মেলায় তিনি স্টলে বসে সই দিতেন এবং এইরকম লাইন পড়ায় আশেপাশের স্টলের লোকজন প্রতিবাদ করায় মেলা কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করেছেন।

কোনও রকমে সামনে পৌঁছে লেখককে দেখতে পেলাম। একটার পর একটা বইয়ে সই দিয়ে যাচ্ছে মুখ নামিয়ে। এখন ও আর তেমন রোগা নেই, লম্বা হওয়ার উপায় নেই বলে শরীরের উচ্চতা একই রয়ে গেছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে দ্রুত চেয়ার ছেড়ে ছুটে এসে হাত ধরল, 'সমরেশদা, আপনি? কখন এসেছেন, কী কান্ড! আমি জানিই না। আসুন, আসুন।' সেখানে দ্বিতীয় চেয়ার ছিল না। সে আমাকে তার চেয়ারেই বসতে বলল। আমি রাজি হলাম না। পাঠকরা যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা অধৈর্য হলেন। হুমায়ুন তাঁদের উদ্দেশে বললেন, 'আপনারা কি অন্ধ? দেখতে পাচ্ছেন না কে এসেছেন? ইনি সমরেশ মজুমদার, ওঁর মতো আমি লিখতে পারি না।'

লজ্জা পেয়ে চলে এসেছিলাম। কথা হল, পরে দেখা হবে। এবং বুঝলাম হুমায়ুন এখনও বিনয়ী।

তখন ঢাকায় রোজা চলছে। কথাটা আমার সবসময় মনে থাকত না। এর একটা কারণ আমার অনেক মুসলমান বন্ধু ওই সময় উপবাস করতেন না। অসুস্থ গর্ভবতী এবং দেশভ্রমণে যাঁরা যান তাঁরা ইচ্ছা করলে রোজা নাও করতে পারেন বলে অনুমতি দেওয়া আছে। 'আমি রোজায় নাই।' শুনলেই আমি জিজ্ঞাসা করতাম, কেন? বেশির ভাগই হেসে উত্তর দিতেন, 'মুসাফির।' তা হুমায়ুন যখন তার বাড়িতে রাত্রে আমাকে নেমন্তন্ন করল তখন আমি অসুবিধায় পড়লাম। সেদিনই আর একটি জায়গায় নেমন্তন্ন নিয়ে বসে আছি। বললাম, 'দুপুরে যাব। তখন খাব।'

হুমায়ুন জিজ্ঞাসা করল, 'কি মাছ পছন্দ করেন?'

আমি সরল গলায় বলেছিলাম, 'কই। যার এক পিঠে ঝোল, অন্য পিঠে ঝাল।'

সেদিন ওর এলিফ্যান্ট রোডের ফ্ল্যাটে গিয়ে জমিয়ে খেয়ে গল্প করে এসেছি। গুলতেকিন ওর স্ত্রী, খুব ভাল মেয়ে। বাচ্চারাও সুন্দর। এই সেদিন হুমায়ুন এসেছিল কলকাতায়। আমি জানতাম সেদিন দুপুরে ওরা রোজা পালা করেছিল অথচ আমি অতিথি হয়ে খেতে চেয়েছি দুপুরে, না বলতে পারেনি। অনেক কষ্ট করে এক হাত লম্বা কইমাছ সংগ্রহ করে ওর স্ত্রী উপবাসে থেকে রান্না করেছিল। বাড়ির সবাই খায়নি, শুধু হুমায়ুন আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে রোজা ভেঙেছিল। শোনার পর অপরাধী বলে মনে হয়েছে নিজেকে। একই সঙ্গে ভেবেছি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কতখানি মমতা থাকলে এই কাজ করা যায়।

ওই সময়ে শুনলাম, হুমায়ুন একটি দ্বীপে বাড়ি করেছে। কক্সবাজার থেকে সমুদ্রের ভেতরে অনেকটা গেলে সেন্ট মার্টিন নামের দ্বীপটির অনেকটাই নাকি তার। জিজ্ঞাসা করতে যেন লজ্জা পেল। বলল, 'চলুন, একবার আপনাকে নিয়ে সেখান থেকে ঘুরে আসি। বর্ষার সময় নয়, তখন সমুদ্রের পানি ঢুকে যায়।'

সেখানে এখনও আমার যাওয়া হয়নি। কিন্তু কোনও বাঙালি লেখক

শুধু উপন্যাস লিখে একটা দ্বীপের অনেকটা জমির মালিক হতে পারে তা আমার কল্পনায় ছিল না। পরে শুনেছি সে একটি প্রাসাদ বানিয়েছে ঢাকার দামী এলাকায়। লেখার সঙ্গে সঙ্গে সে টিভি নাটক করে গেছে একের পর এক। সেগুলো এত জনপ্রিয় হয়েছে যে কোনও একটি নাটকে নায়ককে পরের পর্বে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হতে পারে বলে ঢাকার রাস্তায় বিরাট মিছিল বেরিয়েছিল প্রতিবাদ করে। এরপর তাকে দেখা গেল চলচ্চিত্রে পরিচালক হিসাবে। বিশাল খরচ করে ঢাকার অদুরে একটি স্টুডিও বানিয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে।

বাংলাদেশের মানুষদের অধিকাংশই গরিব। কিন্তু তাঁরা পড়তে ভালবাসেন। পাকিস্তান আমলে যখন ভারতীয় বই ওখানে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল তখন অত্যন্ত কাঁচা হাতে সেই বইগুলো বেআইনিভাবে ছাপা শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের শক্তিমান লেখকরা ভারতীয় লেখকদের বইয়ের অভাব পূর্ণ করতে পারছিলেন না। এই সময়টা চলছিল স্বাধীনতার পনেরো ষোলো বছর পর্যন্ত। হঠাৎ হুমায়ুনের লেখায় তাঁরা নতুন স্বাদ পেয়ে গেলেন। আজকের মানুষের কথা, যে মানুষ স্বপ্ন দেখে। তাঁর মিশির আলি সিরিজ দারুণ জনপ্রিয়। মিশির একজন সত্যসন্ধানী যিনি আমাশায় ভোগেন, ঘুমোতে পছন্দ করেন। আবার আপনার আমার মতো কথা বলেও বুদ্ধি খাটিয়ে রহস্যের সমাধান করেন। হুমায়ুনের বই বিক্রি এখন কিংবদন্তীর মতো।

বছর দুয়েক আগে আমেরিকায় ফিলাডেলফিয়া শহরে যে প্রবাসী বঙ্গ সম্মেলন হয়েছিল সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। হুমায়ুনকেও ওরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমরা একই হোটেলে ছিলাম। অনুষ্ঠানের দিন আমাদের দুজনের সামনে অন্তত হাজার আড়াই বঙ্গসন্তান বসে ছিলেন। হঠাৎ একজন উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা মুসলমানরা বাংলা ভাষা লেখার সময় পানি, আপা, ফুপা লেখেন কেন?'

হুমায়ুন হেসে বলেছিল, 'এইসব শব্দ আমরা জন্ম থেকে বলে আসছি। যেভাবে টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন বলি এবং লিখি। গল্প উপন্যাস লেখার সময় স্বাভাবিকভাবেই লেখায় শব্দগুলো আসে। বাংলা ভাষায় তো প্রচুর বিদেশী

শব্দ এসেছে। আপনাদের নিশ্চয় সেগুলো পড়তে অসুবিধে হয় না!'

হুমায়ুনের পরেই বাংলাদেশের জনপ্রিয় উপন্যাসিকের নাম ইমদাদুল হক মিলন। ওর বয়স এখন চল্লিশের কোঠায়, লেখালেখি এবং টিভির জন্যে নাটক তৈরি করাই ওর পেশা। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় বছর আটেক আগে।

হুমায়ুনের বই যদি এক মেলায় চল্লিশ হাজার কপি বিক্রি হয় তাহলে মিলনের বই বিক্রির পরিমাণ দশ হাজারের মতো। পশ্চিমবাংলায় হাতে গোনা কয়েকজন লেখক রয়েছেন সারা জীবনে যাদের বই দশ হাজার কিংবা তার বেশি বিক্রি হয়ে থাকে। এক বছরে বাইশশো বিক্রি হলেই ধন্য হয়ে যান কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশক। অতএব মিলনের রোজগার যথেষ্ট ভাল। বাংলায় শব্দ সাজিয়ে সে যে বাড়ি করেছে তার দাম এক কোটির মতো।

মিলন যখন প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তখনই সে বিখ্যাত। রঙচঙে জামা এবং জিন্‌স পরতে পছন্দ করে। কখনও জিন্‌সের ওপর পাঞ্জাবি। ও বলেছিল, 'তোমার আঙরাভাসা গল্পটা আমার খুব ভাল লেগেছিল।'

'কখন পড়েছ?'

'কেন? যখন দেশে ছাপা হয়েছিল।'

ওই গল্প যখন ছাপা হয়েছিল তখন মিলনের বয়স পনেরো হয়নি। তারপর বুঝতে পারলাম আমরা পশ্চিমবাংলায় বসে যা লেখোলেখি করি তার সমস্ত খবর সে রাখে। শুধু নামী লেখকের লেখা নয়, অনিল ঘড়াই চক্রধরপুরে বসে কলকাতার লিটল ম্যাগাজিনে কোনও অনবদ্য গল্প লিখলে সে সেটা সংগ্রহ করে পড়ে ফেলে। তিরিশ বা চল্লিশের দশকের লেখকের লেখা ওর প্রায় মুখস্থ। সীমানা, বই না পাওয়া ইত্যাদি সমস্যাগুলো ওর এই পাঠ্যাভ্যাসে কোনও বাধা তৈরি করতে পারেনি।

যতবার ঢাকায় গিয়েছি দেখেছি খবর পেয়ে মিলন চলে এসেছে। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সঙ্গ দিয়েছে। দিনের পর দিন। এটা শুধু আমার একার ক্ষেত্রে নয়, কলকাতা থেকে কোনও লেখক ঢাকায় গেলেই সে সমস্ত কাজ থেকে ছুটি নিয়ে নেয়। এই ভালবাসা আমরা এখানে কেউ এলে দেখাতে

পারি না। কয়েক বছর হল মিলনের গল্প, উপন্যাস প্রায় নিয়মিত ভাবেই কলকাতার কাগজ গুলোতে ছাপা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার পাঠকরা ওর লেখার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ওর উপন্যাস "নূরজাহান" বেরিয়েছে। মুশকিল হল, এদেশীয় পাঠকরা এখনও বাংলাদেশের পাঠকদের মতো ওঁকে গ্রহণ করেনি। এই একই ব্যাপার হুমায়ুন প্রসঙ্গেও দেখেছি। হুমায়ুনের প্রচুর বই কলকাতায় ছাপা হয়েছে এই আশায় যে, এখানেও ও সমান জনপ্রিয় হবে। হুমায়ুন দেশেও লিখছে। আমি জানি এখানে লেখার জন্যে ওরা অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করছে। ঢাকায় না চাইতেই টাকা পায়, কলকাতায় বই বিক্রি না হলে টাকা দেয় না। কিন্তু এখানে ওরা লিখতে চেয়েছে স্রেফ সাহিত্যের প্রতি আনুগত্যের কারণে।

এই লেখা শেষ করার আগে আরও একজনের কথা বলা দরকার। কিন্তু তাঁর কথা কি আমি হুমায়ুন বা মিলনের পাশাপাশি বলতে পারি? এ সংশয় আমার ছিল। কিন্তু মাত্র এক দেড় বছরের জন্য হলেও বই বিক্রির ব্যাপারে ওদের প্রায় পেছনে তিনি চলে এসেছিলেন তাই এই লেখায় ওঁকে আনা যেতে পারে। বাংলাদেশের লেখকদের সম্পর্কে এদেশীয় পাঠকদের স্বচ্ছ ধারণা নেই নানান কারণে। ব্যতিক্রম তসলিমা নাসরিন। কিছু মানুষ এবং খবরের কাগজ ক্রমাগত বাতাস করে যাওয়ায় পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ মানুষ এই নামটির সঙ্গে পরিচিত।

তসলিমা প্রথম আনন্দ পুরস্কার পেয়েছিলেন যে বছর, আমি সেই অনুষ্ঠানের দর্শক ছিলাম। দূর থেকে দেখেছি আলাপ হয়নি। ওঁর মধুর এবং নির্বাচিত শব্দের ভাষণ শুনেছি। ভাল লেগেছিল। কেউ কেউ ফিসফাস করেছিলেন। মাত্র একটি ফিচারের বই লিখে আনন্দ পুরস্কার পেয়ে গেল? আমি পাত্তা দিইনি, পুরস্কার যাঁরা দিয়ে থাকেন তাঁদের ইচ্ছেটাই শেষ কথা।

তারপরে আমার প্রকাশক পাল পাবলিশার্সের আমন্ত্রণে ঢাকায় গিয়েছি। উঠেছি ঢাকা ক্লাবে। সেখানে তখনকার বিরোধী পক্ষ আওয়ামি লিগের দ্বিতীয় সারির নেতারা আসতেন আড্ডা মারতে। মধ্যরাত পর্যন্ত পান এবং গল্প চলত।